শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজদর্শন

প্রণবেশ চক্রবর্তী

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

অকালে প্রয়াত আমার পিতৃদেব
অমূল্যচন্দ্র চক্রবর্তী
যিনি আমাকে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।
আর অতৃপ্ত কামনা-বাসনা নিয়ে লোকান্তরিতা
আমার মা কল্যাণী দেবী
যাঁর আশীর্বাদ আমার পরম সম্পদ
তাঁদেরই পুণ্যস্মৃতিতে সমর্পিত

ভূমিকা

বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ—ওঁরা কেউই সমাজ-বিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু ওঁদের প্রভাবে নূতন সমাজ গড়ে উঠেছে। কি করে এটা সম্ভব হয়েছে? তাঁদের কথা ও আচরণের দ্বারা। তাঁরা এমন কথা বলেছেন এবং এমন কাজ করেছেন যার মধ্যে একটা 'সুসম-সমাজ গঠনের ইংগিত পাওয়া যায়। সুসম-সমাজ গঠন হয় কি করে? মানুষের সংগে মানুষের যদি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। কোন মানুষই হেয় নয়, কোন মানুষই আমার পর নয়। বস্তুতঃ আমরা সবাই এক। সকলের সুখে আমার সুখ, সকলের দুঃখে আমার দুঃখ। সমাজে বৈচিত্র্য থাকতে ছোট-বড় ভালো-মন্দ থাকবে, তবু সবার মধ্যে এক ঈশ্বর বিরাজ করছেন। তাই আমি কাউকে আঘাত করতে পারি না, ঘৃণাও করতে পারি না। আমি পারি শুধু ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে, সেবা করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়েছেন, নিজে এটা আচরণও করেছেন। দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্যে যে সমাজ গড়ে ওঠে, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্যেই আবার অবলুপ্তি ঘটে।

'শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজ-দর্শন' বইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি মৌল চিন্তা ও আচরণের কথা আছে। সেই যুগের পটভূমিকায় এই চিন্তা ও আচরণ বিপ্লবাত্মক বলে মনে হয়েছে। লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গটি যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন এই বই-এর পাতায়। এ আলোচনা সার্থক, কারণ এর দ্বারা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের এক নূতন দিক্ দেখতে পাই! আশা করি লেখক এ বিষয়ে পরে আরও অনেক লিখবেন এবং আমাদের কৌতূহলকে চরিতার্থ করবেন। ইতি—

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

বিষয়সূচী

বিপ্লবের পটভূমি ধর্ম

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার দুরন্ত গতিবেগে অর্ধাংশ আলোকিত আমাদের এই ভূমণ্ডলে কখন কোন্ গোলার্ধে আলোর ভাগ পরিব্যাপ্ত হবে রাতের অন্ধকারকে সঙ্কুচিত করে—সে রহস্যময় তত্ত্বকথা ভৌগোলিকের এক্তিয়ারে। আমরা পড়েছি একদা, সেই আমাদের স্কুল-জীবনে। কিন্তু যে দিনটা দিনের বয়সে বড়দিন, সেই দিনটাই মহিমার বড়ত্বেও বড় হয়ে গেল কিভাবে এবং কেন, সে রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত। কাকতালীয় যোগাযোগ বলে অবিশ্বাসীরা অনেক কিছুই হাস্যভরে উড়িয়ে দেন, সম্ভবত যেখানে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি আমারই মত সীমাবদ্ধ, সেখানেই 'কাকতালীয়' শব্দটি বহু প্রযুক্ত, অবশ্যই সকল ক্ষেত্রে নয়।

দীর্ঘতম দিনে মহত্তম পুরুষদেরই একজন এই ধরাধামকে স্বীয় জীবনের ত্যাগ, মাধুর্য এবং মহিমায় বিভূষিত করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কেন এবং কিভাবে-সে প্রশ্নের উত্তর প্রকৃত পক্ষে কারুরই জানা নেই। 'কাকতালীয়' শব্দটিকে কোন ক্ষেত্রেই আমি বাতিল করতে চাই না, আবার 'সর্বরোগহর মহৌষধি' হিসেবে সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করাতেও রাজী নই। একদা এই পৃথিবীতে ধর্ম নিয়েই মাতামাতি হত—যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান সেদিন দুয়োরানীর মত অন্ধকারে কিংবা গৃহকোণে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল ধর্মান্ধতার প্রবল দাপটে। তাতে মানব সমাজের অনন্ত জয়যাত্রার পথ আদৌ সুস্থিত বা সুগম হয় নি। ধর্মের ধ্বজাধারীরা পৃথিবী থেকে, মানুষের জীবন থেকে পার্থিব দুঃখ দুর্দশাকে দূর করতে পারেন নি, পারবেন

যে, তেমন কোন ইঙ্গিতও দিতে পারেন নি সেদিন। তবুও সেই মতান্ধতার আমলেই সক্রেটিস জন্মেছিলেন। জন্মেছিলেন গ্যালিলিও এবং আর্যভট্ট, বরাহমিহির। ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগেই যুক্তি তথা বিজ্ঞানের বিজয়-বার্তা ঘোষিত হয়েছিল সভ্যতার জয়-যাত্রারই স্বার্থে। আবার আজ যখন বিজ্ঞানের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তৃত, তখন আমরা দেখি, মানুষের মনে সব কিছু পেয়েও অনেক কিছু হারানোর যন্ত্রণা। পার্থিব সুখ-সুবিধার পাশাপাশি অন্তহীন শূন্যতা মানুষকে আজ বিভ্রান্ত করে তুলেছে। জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে মানুষ কি মানুষ থাকতে পারে?

তাই এই বিজ্ঞানের সদম্ভ আস্ফালনের যুগেই আবির্ভূত হন শ্রীরামকৃষ্ণ। কামারপুকুর নামে অখ্যাত গ্রাম, যেমন অখ্যাত ছিল বেথলেহেম—সেই অখ্যাত গ্রামের গদাধর কেন এবং কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণে রূপান্তরিত হলেন এবং সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাববাহী বিবেকানন্দের আবির্ভাব যুগ ও কালের গতিকে কী প্রচণ্ড শক্তিতে এবং কিভাবে প্রভাবিত করেছিল—সেই সব যুক্তি সঙ্গতপ্রশ্নের উত্তর কি বিনা আয়াসেই সহজেই পাওয়া যায়? এক্ষেত্রেও কি 'কাকতালীয়' কথাটা প্রযোজ্য? অথবা সেটা হবে আমাদের সার্বিক অজ্ঞতারই নামান্তর।

বড়দিন এলেই আমার চিত্ত জুড়ে যেমন যীশুখ্রীষ্ট অধিষ্ঠিত হন, মনে হয় তেমনি আমাদের জীবনে প্রতিদিনই কেন বড়দিন হয় না, কেন আমরা প্রতিদিনই আমাদের মনের বেথলেহেমে শিশু-যীশুর আবির্ভাব লগ্ন অনুভব করি না? আমরা যখন হাত পাকাই স্বার্থ-সিদ্ধির মতলবে, যখন ব্যক্তিস্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলিপ্রদান করি সমষ্টির স্বার্থকে, যখন কর্তব্যপালনে চরম অনীহা দেখিয়ে সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করি নির্লজ্জের মত—তখন আমরাই যীশুর পরম করুণাময় অস্তিত্বকে নিজেদের কলঙ্কিত হাতে ক্রুশবিদ্ধ করি, রক্তাক্ত কলঙ্কিত হাতে নৃশংস ঘাতকের মতই হত্যা করি নিজের শুভবুদ্ধি এবং

মনুষ্যত্বকে। সেই মনুষ্যত্বহীনতার আত্মঘাতী পথ থেকে মুক্তির জন্যই আরেকটা রাজপথের প্রয়োজন—সেটাই আজকের জগৎ ও জীবনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পথ।

দীনবন্ধু দাদা সান্‌তা ক্লস শুধু মনগড়া প্রতীক নয়, এ'ত শাশ্বত ও জীবন্ত সত্যেরই প্রতিমূর্তি। উপহার আর মিষ্টান্ন হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন যে বৃদ্ধ লাল ঝোলা কোট গায়ে, বরফশুভ্র দাড়ি-গোঁফে আচ্ছাদিত মুখমণ্ডল যার, সেই ঋষি সান্‌তা ক্লস, নাম নিকোলাস, বিশপ অব মাইরা তাঁকেও স্মরণ করি আমরা। এই মহাপুরুষের সত্য-সন্ধানী জীবনের ছায়াপাত আমাদের জীবনে কতটুকু ঘটে—সেই হিসেব করি কতজন? গভীর সমুদ্রে জাহাজ যখন সাগরতলে তলিয়ে যেতে বসে, তখন অসহায় নাবিকদের আর্তস্বরে ধ্বনিত হয় সান্‌তা ক্লসের নাম—কারণ মাইরা নামে এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুর্কী) দক্ষিণ উপকূলের সমুদ্র-তীরস্থ নগরীতে যাতায়াতের জন্য নিকোলাস নির্ভয়ে নৌকো ব্যবহার করতেন, সমুদ্র-জয়ের সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে বলেই তিনি সাগর-বিপদে ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। আবার তাঁরই প্রতিবেশী কোন ভদ্রলোক যখন অর্থাভাবে স্বীয় তিনটি কন্যার বিবাহ দিতে অপারক হয়ে অজানা আশংকায় উদ্বেলিত, তখন সেণ্ট নিকোলাসই আত্মপরিচয় গোপন করে একমুঠো সুবর্ণ মুদ্রা রেখে আসেন অসহায় পিতার ঘরে।

মানুষের সেবা এবং দুর্গতের মুক্তি—এই আদর্শ নিয়ে সারা জীবন যিনি মানুষের করুণাময় সঙ্গী সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবসেবার' আদর্শ আত্মদানের সংকল্পে সুদৃঢ় করে তুলেছিল যাঁকে—সেই যুগনায়ক বিবেকানন্দকে যখন স্মরণ করি, তখন তাঁর জীবন-বেদ সম্পর্কেই বা আমরা কতজন থাকি সচেতন? পরদেশের সাধু নিকোলাস কিংবা স্বদেশের সাধু নানক—আমরা সর্বত্রই পাই সম-গোত্রের আদর্শ। কিন্তু অভিন্ন আদর্শ আমাদের বৃহত্তর জীবনকে একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে কতটুকু? ধর্ম কোন বেচাকেনার

জিনিস নয়, নগদ মূল্যে আর যা কিছুই ক্রয়যোগ্য হোক না কেন—সত্যধর্ম সেখানে বহুদূরস্থিত সম্পদ। তাই, আমরা যখন অন্তরের নিঃস্বতাকে গোপন করে বাহ্যিক আড়ম্বরে ধর্মের পবিত্রতাকে শুধু মাত্র উন্মত্ততায় পর্যবসিত করি, তখন শুধু মনে হয়ঃ আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করি।

যে প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করেছিলাম, আবার ফিরে যেতে চাই সেখানেই। রাজার আদেশে বিতাড়িত যোসেফ আসন্ন প্রসবা সহধর্মিণীকে নিয়ে আশ্রয় পাননি কোন পান্থশালায়, শেষ পর্যন্ত এক গোশালায় যোসেফ দম্পতি মাথা গোঁজার অনধিকার ঠাঁই পেয়েছিলেন, আর সেখানেই, সেই তিমিরাচ্ছন্ন মধ্যরাত্রে শান্তিরাজ যীশু আবির্ভূত হলেন গোশালায়। এটাও কি কোন 'কাকতালীয়' ঘটনা? শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান ঢেকিশাল। কামারপুকুরের ঢেকিশাল থেকে বেথলেহেমের গোশালা—অনেক অনেক দূরের পথ, অনেক অনেক সময়ের, কিন্তু যদি ঘটনার সাযুজ্যের কথা বিবেচনা করি, ভেবে দেখি আত্মিক-সংহতির কথা, তাহলে দেখব, দেশকালের দূরত্ব নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে পথের সীমা হয়েছে বিলীন। মনে হয়ঃ এটাই সম্ভবত সঠিক হয়েছে। প্রাসাদে যদি যীশুর জন্ম হত—তাহলে দুঃখীজনের জীবনে সেটা কি এক অভিনব ঘটনা হত না? গোশালার সেই পাংক্তেয় পরিবেশ এক মহৎ জীবনকে জন্মলগ্নে ধারণ করেছিল, যেমন করেছিল ঢেঁকিশাল! ভুলতে কি পারি কিছুতেই যে, শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মস্থান কারাগার। রাজদ্বার হলেও আপত্তি ছিল না —তবু হয় নি। কেন হয় নি সে প্রশ্নের কোন সদুত্তর জানি না। তবে যন্ত্রনা বিক্ষুব্ধ মানুষের মুক্তিদূত যাঁরা, যাঁরা সামাজিক বিপ্লবের পথ আত্মদানের মাধ্যমেই নির্মাণ করে গেছেন—তাঁরা পথের মানুষ, তারা সংগ্রামের পীঠস্থানে সাধকের ভূমিকায় সমাহিত।

তাই কপিলাবস্তুর রাজকুমার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যখন পথের ধূলায় নেমে এলেন, তখনই তিনি মহামুক্তির প্রাক্‌প্রতিভূ। জরা-

দুঃখ-দৈন্যের কারাগার ভেদ করে যাঁরা অসীম অনন্তলোকের যাত্রী —তাঁদের জন্য ভগ্নকুটিরই অপেক্ষমান, রাজপ্রাসাদ নয়। ফলে কপিলাবস্তুর রাজকুমারকে আমরা তখনই অমৃতময় মূর্তিতে দেখি যখন তিনি বৃক্ষতলে আশ্রিত। গোশালায় কিংবা ঢেঁকিশালায় যাঁদের আবির্ভাব, তাঁরা মহাযুগের নিয়ন্ত্রণ শক্তিতে উদ্‌ভাসিত, আর রাজ-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে যিনি পথের আসনে আত্মস্থ, তিনিও এক মহাজীবনের পরিপূর্ণস্বরূপ। এঁদের প্রত্যেকেরই প্রতিটি দিন বড়দিন, মহৎ চিন্তা মহৎ কর্মের দিন। শ্রীচৈতন্যের কথাই ভাবুন। সংসারের সুখ নয়, সংসারের দুঃখকে তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন, সমাজ বিপ্লবের অগ্নিরথে তিনি তীর্থপতি। তাই, সংসারকে ত্যাগ করেও তিনি সংসারকে ধারণ করেন। জগতের পাপভার দুঃখকে দুহাতে তুলে নিয়ে তিনি মৃত্যুঞ্জয়। সকলেরই গতি এক লক্ষ্যের দিকে কেন? দুঃখের সমুদ্র মন্থন করেই সকলে অমৃত তুলে দিলেন কেন মানুষের হাতে? এ সবই কি 'কাকতালীয়' ঘটনা? অথবা, আমরা এখনও শেষ রহস্যের সন্ধান পাই নি, সন্ধান পায় নি বিজ্ঞানের অতন্দ্র সাধনাও।

বস্তুতান্ত্রিকতার মোহাবিষ্ট যাঁরা, অন্ধ তাঁরা—তাই সমাজ বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তির সন্ধান তাঁরা পান নি। অন্যায়, অসত্য এবং অত্যাচার যখনই জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে, তখন বারবার বড়দিন এসেছে, কখনও যীশুর আবির্ভাব, কখনও বুদ্ধদেবের আগমন, কখনও চৈতন্যের অবতরণ, কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব, আবার কখনও শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়। সুবিধাবাদী ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধেই তাঁদের সংগ্রাম, মানুষের একতা এবং সমতার আদর্শই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন, ধর্মকে মানুষের মর্মবাণীতে পরিণত করেছেন। জগতে বারবার তাঁরাই বিপ্লবের অগ্রদূত। আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পথ ধরেই সমাজ-বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, এবং সেই সমাজবিপ্লবই রাষ্ট্র-বিপ্লবকে এগিয়ে দিয়েছে সম্মুখপানে। এ সব ইতিহাসের ঘটনা—

শুধু চোখ মেলে দেখা চাই। মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত কিংবা পঞ্চনদের তীরে নবজাগরণ—সর্বত্রই কি আধ্যাত্মিক বিপ্লবের উত্তরাধিকারী সমাজ-বিপ্লব নয়?

আজ তাই আমাদের জীবনেও সার্বিক রূপান্তর ঘটাতে হলে মূল্যবোধের পুনর্বাসন চাই, চাই আধ্যাত্মিক অভিনব বিপ্লবের পুনর্জাগরণ। সেই অনাগত বড়দিনের জন্য আমরা প্রতীক্ষারত, কারণ বড়দিন শুধু একদিন নয়, আমাদের জীবনে প্রতিদিনই তার পদধ্বনি শুনতে চাই। সেইজন্যই মহাকালের গতি পথে কান পেতে আমরা অপেক্ষমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম

বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক বহিরঙ্গের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই বিশ্ব জুড়ে বারবার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ ও বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে, রক্তপাতও হয়েছে প্রচুর। একটা সময়ে অলৌকিকতার মূলধনকে কাজে লাগিয়ে পুরোহিত তন্ত্র হিন্দু ধর্মকে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, যার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় বেদান্তবাদী বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মও পুরোহিত তন্ত্রের হাতেই সমর্পিত হয়, যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও অলৌকিকতার মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে। আর তার ফলে আরেকজন বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম—এই সত্যটাকে কোন যুগে কেউ কি অস্বীকার করতে পেরেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব আমাদের ধর্মীয় চেতনাকে এখন নতুন ঐশ্বর্যে প্রদীপ্ত করেছে। অলৌকিকতা কিংবা ম্যাজিক নয়, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সাধনায় ধর্মলাভের বাস্তব পন্থা তিনিই দেখালেন। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়ে যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বর পাবে—এই বক্তব্যটি বোঝাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন একটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করেছেন, যা তার একান্তভাবেই নিজস্ব সম্পদ। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র প্রসঙ্গে উপমাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন "দেখ, অমৃত সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে এ সাগরে পড়তে পারলেই হল। একটু আস্বাদন করলেই অমর হবে।" (কথামৃত, ১/১১/৪)। রুচি এবং ক্ষমতা অনুসারে ধর্ম

পিপাসু জ্ঞান, ভক্তি বা কর্মযোগ অনুসরণ করবে—ধর্মের এই শাশ্বত-রীতিকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা এক বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধিগ্রাহ্য পথ ও পন্থা।

আমরা সেই পথে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হই না; বরং মনে করি, দেবতাকে কিছু ঘুষ দিয়ে যদি নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করা যায় মন্দ কি? তাই, যখনই কোথাও কোন অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের সন্ধান পাই, তখনই পাগলের মত ছুটতে থাকি সেদিকে। মনে মনে একটা ধান্দা, যদি কিছু বাগিয়ে নেওয়া যায়। তারকেশ্বরের মহাদেব জাগ্রত দেবতা—লক্ষ লক্ষ মানুষ তারকেশ্বরের পায়ে হেঁটে ছুটে যায়। সে কি দেবতার প্রতি ভক্তিতে, অথবা নিজের ধান্দা পূরনের জন্য? এই দুর্বল মানসিকতা ব্যাপক ও বহুলভাবে আছে বলেই অলৌকিকতার ফাঁদ পেতে বারবার মানুষকে প্রতারণা করা হয়েছে। ভক্তি—সেত নিষ্কাম। সকাম ভক্তি পাটোয়ারি বুদ্ধি, যদি কিছু পাই—সেই লোভ।

আমাদের এই লোভ আছে বলেই মাঝে মাঝে দেবীর চোখে জল দেখা দেয়, ফুয়া বাবা বা পাগল বাবার আবির্ভাব ঘটে এবং হাত বাড়িয়ে সোনা ধরার কৌশল দেখা দেয়। মানুষের প্রতি যে মানুষ সৎ নয়, প্রতিবেশীর প্রতি যে মানুষ বিশ্বস্ত নয়, সামাজিক ধর্মপালনে যে মানুষ নিষ্ঠাবান নয়—সে কি অলৌকিক প্রক্রিয়ার ধার্মিক হতে পারে? জাল ও ভেজালের কারবারে দেশ ছেয়ে গেছে, মুনাফাখোরী এবং কালোবাজারের দাপটে জনজীবন বিপন্ন, শিশুর মুখের দুধ নিয়েও চলেছে ফাটকাবাজার—তবুও মন্দিরের পর মন্দির গড়ে উঠেছে। এই দেখেই কি বুঝতে হবে, আমরা সব ধার্মিক হচ্ছি?

ভগবান শ্রীচৈতন্য সর্ব জীবের মুক্তি এবং যুগান্তকারী প্রেম ধর্মের পথ আমাদের সামনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা সেই মহৎ মানব ধর্মকে কি অক্ষত ও অবিকৃত রাখতে পেরেছি? ধর্মের নামে ব্যভিচার আমাদের সুস্থ সবল চৈতন্যকে বিষাক্ত দংশনে ক্ষত বিক্ষত করেছে। জগাই-মাধাইকে দমন করে শ্রীচৈতন্য যে মানব

ধর্মের সূত্রপাত করেছিলেন—সেখানে কাপুরুষতার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে আগাছার মতই একশ্রেণীর বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী সেই নিন্দিত কাপুরুষতাকে সম্বল করেই আমাদের ইতিহাসকে চালিত করেছেন ভ্রান্ত পথে।

একদিকে যেমন ধর্মের নামে ব্যভিচার, অন্যদিকে তেমনি ধর্মের নামে ম্যাজিক—সবকিছুই শেষ পর্যন্ত ব্যবসাদারীতে পরিণত হয়েছে। মূল ধর্মের শাশ্বত সত্য কালো মেঘের আড়ালে আচ্ছাদিত। একটা সামান্য কিছু পেতে হলেও বেশ কিছুটা পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু ধর্মের স্বাদ পাওয়ার জন্য আমরা বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠা দেখাতে রাজী নই। তাই ভোজবাজীর মতই অলৌকিক ব্যাপারে মুগ্ধ হই। হই বলেই সেই সুযোগে ফিকির বাজরা বেমালুম ব্যবসা করে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে। 'সম্মোহনী কবচ' কিংবা 'অব্যর্থ মাতুলীর' বিজ্ঞাপন আমরা প্রায় সবাই দেখেছি, এই কবচ বা মাতুলী ধারণ করলে জ্যান্ত রাজকন্যাসহ অর্ধেক রাজত্ব হাতে পাওয়া যায়। আমরা ভাবি, সব বুজরুকি। কিন্তু সবাই কি তা ভাবে?

এ রকম 'কবচের' ব্যবসা করেন, এমন একজনকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম: আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখে কে হাড়ি কাঠে গলা দেয়? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: পাঁচ লক্ষ লোকের মধ্যে কি পাঁচ হাজার গাধা নেই? এই পাঁচ হাজার যদি টোপ গেলে, তাহলেই হোল, এর বেশী আর দরকার কি?

ব্যাপারটা ঠিক তাই। সবাই আমরা হাতে হাতে ফল চাই, রাতারাতি বড়লোক হতে চাই। তাই, চীটফাণ্ডের কারবার দেশ জুড়ে জমে উঠেছে; তাই ধর্মের নামে অলৌকিকতার প্রসার ঘটেছে। কোন সার্বজনীন পূজামণ্ডপে 'প্রতিমার চোখে জল'—এই খবরটা চোখে দেখে একবারও কি নিজের বুদ্ধি ও বিবেককে প্রশ্ন করি না: এটা কি ঠিক? এটা কি হতে পারে?

যুক্তি ও বিচার ভিন্ন কি কোন সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়? ধর্মও

বিজ্ঞান। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই ধমবিজ্ঞানও বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এ ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার ভাব-বাহী স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্বাভাবিক কারণেই উল্লেখ করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী। কৌতূহল বৃত্তি তার জন্মগত। যুক্তি ছাড়া কোন কিছু মেনে নিতেন না তিনি, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর—কিন্তু সেই বিশ্বাসও ত যুক্তি নির্ভর, জ্ঞান ভিত্তিক অজ্ঞান বা অবোধের কি কোন বিশ্বাস থাকে ? শৈশব থেকেই সত্যানুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন তিনি এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেও পরীক্ষা করেছেন নানাভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, কারণ তিনিও চাইতেন যাচাই করে সবকিছু গ্রহণ করতে। সকল ধর্ম নিজের জীবনে ঠাকুর গ্রহণ করেছিলেন পরীক্ষান্তে। নিবেদিতাকে স্বামীজী বলেছিলেন: প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস করো না। আমিও আমার গুরুকে যাচাই করে নিয়েছি।

বিজ্ঞান সম্মত এই যে মহৎ ধর্ম—সেই ধর্মকে যারা অলৌকিকত এবং ম্যাজিক দিয়ে বন্ধ্যা করতে চান—তাঁরাই ধর্মের বিরুদ্ধচারণ করছেন, তারাই ক্ষতি করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের সামাজিক তাৎপর্য

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সময়কাল—ভারতের ইতিহাসে তা' যেন শুধু সংশয় আর অবিশ্বাসের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। পশ্চিমী প্রভাবের ছত্রছায়ায় আত্মসমর্পণ করে নিরাপদে রাজানুগ্রহে বাস করার মানসিকতায় তখন জনজীবনের একটা বড় প্রভাবশালী অংশে সহজেই জড়বাদ এবং নাস্তিকতা বিস্তার করেছিল প্রাধান্য। ফিরে তাকাই যদি সেই তমসাচ্ছন্ন যুগের অন্তরলোকে, তাহলে দেখব খ্রীষ্টান মিশনারীরা সংঘবদ্ধ সংকল্প নিয়ে কীভাবে হিন্দুধর্মের নিন্দায় অভিযাত্রী এবং কীভাবে ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরিত করার অভিযানে স্থির প্রতিজ্ঞ। শুধু এই একটা বিরুদ্ধ স্রোতই নয়, ভারতীয় জনজীবনের উপর দিয়ে তখন আরেকটা প্রবল স্রোতও হচ্ছিল প্রবাহিত। পাশ্চাত্যের ভোগ-বিলাসী জীবনে ধর্মবিমুখ বিজ্ঞানের সাফল্য এবং মাহাত্ম্য প্রচলিত মূল্যবোধ এবং ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিল। হয়েছিল কিছুটা সফলও।

এই দুই জগৎ-জয়ী শক্তির প্রভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের মহিমান্বিত ঐতিহ্য, ভক্তিশ্রদ্ধা, গুরুপরম্পরা, রীতিনীতি ইত্যাদি যা' কিছু, সবই যেন উনবিংশ শতাব্দীর উষাকালের প্রদোষে সংশয়ের দোলায় দুলে উঠল। কিন্তু শাশ্বত ভারতবর্ষের প্রাচীন আত্মা অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তিতে সঞ্জীবিত ছিল বলেই সেই সুপরিকল্পিত আক্রমণের মুখেও নিঃসীম অনিশ্চয়তার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি। আমরা যদি প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, গ্রীস, রোম, মিশর বা চীনের দিকে তাকাই,

তাহলে দেখব মহাকালের স্রোতে সেইসব দেশ থেকে অতীত ঐতিহ্যের প্রাণময় অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে, শুধুমাত্র কিছু অবলুপ্তপ্রায় স্থাপত্য বা সাহিত্য কিংবা দর্শনের সংরক্ষিত ভাণ্ডার দেখিয়ে আজ সেইসব দেশে প্রাচীনত্বের মহিমা কীর্তন করা হয়ে থাকে। প্রাচীন সেইসব দেশের সবকিছু এখন ইতিহাসের সম্পদ। বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

অথচ ভারতবর্ষের সর্বজয়ী সভ্যতা নিজস্ব মহিমার বৈভবে বাইরের এবং ভিতরের সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করেছে সবলে। তারই বাস্তব প্রকাশ ঘটল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে। খ্রীস্টানদের সুপরিকল্পিত অভিযান এবং বিজ্ঞানের বিজয়যাত্রার প্রবল পরাক্রান্ত স্রোতের মুখে এসে যাঁরা মাথা তুলে দাঁড়ালেন, দাঁড়ালেন ভারতের দীপ্ত ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪—১৮৩৩) নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নিরাকার একেশ্বরের উপাসনা করার নামে "আত্মীয় সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। এই আত্মীয় সমাজই ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে "ইউনেটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" নাম ধারণ করে। পরবর্তীকালে এরই সূত্র ধরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) "ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন (রামকৃষ্ণের জীবন, পৃঃ ৭৮): তাঁর প্রেরণার উৎস প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ছিল উপনিষদ। তবে সেগুলিকে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করেন। রামমোহন রায়ের প্রেরণার উৎসটি কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক প্রকারের ছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের চারটি মূল-নীতি স্থির করেছেন। সেগুলি হচ্ছে:

(১) আদিতে কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র ছিলেন একজন পরমপুরুষ। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি করেন।

(২) তিনিই একমাত্র সত্যের, অসীম জ্ঞানের এবং শক্তির ভগবান। তিনি সনাতন, সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়।

(৩) তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর পূজার উপরই আমাদের ইহকাল ও পরকালের মুক্তি নির্ভর করছে।

(৪) তাঁকে ভালোবাসা এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করাই হল ধর্ম।" হিন্দুসমাজকে সংস্কার এবং খ্রীষ্টান প্রভাব প্রতিহত করার লক্ষ্যটাই এই নতুন আন্দোলনের সামনে প্রবল ছিল।

কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ তাত্ত্বিক দিক থেকে যদিও ধর্মক্ষেত্রে একেশ্বর-বাদী, মূর্তিপূজাবিরোধী, গুরুবাদে অবিশ্বাসী এবং অবতারবাদ-বিদ্বেষী ছিল, কিন্তু বাস্তবে এই সম্প্রদায় আগাগোড়া স্ববিরোধিতায় ছিল আচ্ছন্ন। তাই দেখি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যত না ব্রাহ্ম ছিলেন, তার চাইতে বেশি ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাই, কোনো অব্রাহ্মণের সঙ্গে যেমন তিনি তাঁর পরিবারের কোনো মেয়ের বিয়ে দেননি, তেমনি কোনো অব্রাহ্মণের মেয়েকে বাড়িতে বধূ করেও আনেন নি। তাছাড়া পুত্রদের হিন্দুমতে উপনয়ন দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান। শুধুমাত্র দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্রাহ্ম সমাজে দেখি স্ববিরোধিতা। একদিকে ব্রাহ্মসমাজ যখন বাল্যবিবাহ উচ্ছেদ করার জন্য কঠোর সংকল্পবদ্ধ, অন্যদিকে তখন এই সমাজেরই অন্যতম প্রধান পুরুষ কেশবচন্দ্র সেন নিজের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় সেই কঠোর সংকল্পকে হেলায় অগ্রাহ্য করেন। তারই ফলে শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে ১৮৭৮ সালে গঠিত হয় "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।" এই যেমন এক দিকের ছবি, তেমনি অন্যদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেহেতু ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদে "অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্র সেনকে" বরণ করে নিতে রাজি হননি, সেইহেতু কেশবের নেতৃত্বে তিন নম্বর ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম হয়—নাম যার হয়েছিল "নববিধান সমাজ।"

এভাবেই যখন ব্রাহ্ম সমাজ এই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে ক্ষীণশক্তি হয়ে পড়ছিল, তখন নিজস্ব পরিমণ্ডলে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের স্ববিরোধিতা জনমনে সৃষ্টি করছিল অশ্রদ্ধার ভাব। এরকম একটা অস্থির ও সংস্কারাচ্ছন্ন সময়েই ভারতের ধর্ম-আন্দোলনের

ইতিহাসে আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য নাম যুক্ত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাই নগরীতে "আর্য সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই একই বছরে মাদাম ব্ল্যাটাভাটস্কি "থিয়োজফিকাল সোসাইটির" সূত্রপাত করেন। "থিয়োজফিকাল সোসাইটি"র জন্ম নিউইয়র্কে। পরে কিছু কিছু মত ও পথের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারতের নিজস্ব প্রয়োজনের অনুযায়ী করে সেই সোসাইটিকে ভারতে নিজস্ব নিয়ে আসা হয়।

রোমাঁ রোলাঁ (রামকৃষ্ণের জীবন, পৃঃ ৭৬) বলেছেন: 'ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়িত করা দূরে থাকুক, রামমোহন চাইতেন, ইংরেজরা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হোক।...ইংলণ্ডের সঙ্গে সহযোগিতার এই বিশ্বস্ত কর্মী ও প্রচারক ইংলণ্ডের সঙ্গে অকপট আলোচনা করতেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে জানাতেন, তাঁর দেশের জনসাধারণের প্রগতির কার্যে ইংলণ্ড নেতৃত্ব করবে।" কেশবচন্দ্র সেন প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁর বক্তব্য (পৃঃ ৮১): খ্রীস্টকে ব্রাহ্মসমাজে একদল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষীর অন্তরে আনাটাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আদর্শ হয়ে ওঠে।"

এই অবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তা বৃহত্তর যে ভারত—সেখানে এর কোন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই সময়েই ডিরোজিওর প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গল শ্রেণীর উদয় হল। এই ইয়ং বেঙ্গল শ্রেণী ভারতের সবকিছুকে নস্যাৎ করে বুদ্ধিজীবী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বিচার বিশ্লেষণে হলেন পারঙ্গম। তাঁরা ঘোষণা করলেন: "আমরা ধর্ম, ঈশ্বর, পরলোক—এসব কিছুই মানিনা। নাস্তিকতা এই শ্রেণীর মধ্যে এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, এঁরা মা কালীকে "ম্যাডাম" বলে সম্বোধন করে প্রীত হতেন। এই নাস্তিক্যবুদ্ধি বিপজ্জনক চেহারা ধারণ করাতেই বাংলাদেশে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজও আত্মরক্ষায় এগিয়ে এলেন। জন্ম হল 'হিন্দু পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে'র—সে সম্পর্কে

পরে আলোচনা করব। তারই পরিণামে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই অবস্থায় ব্রাহ্ম হয়েও মনে প্রাণে ব্রাহ্মণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজও হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের সঙ্গে সমান তালে খ্রীষ্টানদের প্রভাব এবং নাস্তিক্য বুদ্ধিকে প্রতিহত করতে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

এই পটভূমিকায় একটা বিষয় স্পষ্ট যে শ্রীরামকৃষ্ণের যখন আবির্ভাব হয় (১৮৩৬), উনবিংশ শতাব্দীর সেই সময়কালে ভারতে ধর্মনায়কের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। রাজা রামমোহন যেমন তখন বহু উচ্চারিত নাম, তেমনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী দয়ানন্দের প্রভাবও তখনই অনুভূত। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রামেন্দ্রসুন্দররা আসরে অবতীর্ণ। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে কি?—এমন প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই দেখা দিতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, একালের সকল ধর্মনায়ক যখন দল তৈরি করে নিজের বক্তব্য প্রচার করেছেন, পত্রিকা বার করে নিজের কথা সবাইকে শুনিয়েছেন এবং প্রয়োজনমত একে অন্যকে আক্রমণ করেছেন, তখন এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো দল ছিলনা, পত্রিকা ছিলনা এবং ছিলনা কোনো শিক্ষার কৌলীন্যও। তিনি ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান বা হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের মতো কারোর বিরুদ্ধে লড়াই করেননি, তর্কযুদ্ধে নামেননি, কাউকে ছোট বানাতে চেষ্টাও করেননি, শুধু সবাইকে ডেকে বলেছেন: মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হল ঈশ্বরলাভ। অর্থাৎ এতদিন যাঁরা এলেন, ধর্ম প্রচার করলেন, তাঁদের সকলেরই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, ছিল সীমাবদ্ধতা, ছিল অপূর্ণতা—যা সম্পূর্ণ করতে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, যিনি বললেন: যত মত তত পথ।

রাজা রামমোহন রায় প্রচার করলেন, একেশ্বরবাদই ভারতীয় ধর্মের আসল রূপ এবং বহুদেবদেবী প্রথা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি অনার্য

সংস্কৃতিরই ধারা। কিন্তু রামমোহন যখন এরকম প্রচারে আত্মমগ্ন, তখন তাঁর সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে সমগ্র ভারত প্রতিফলিত হয়নি। হয়নি বলেই কোল-ভীল-মুণ্ডা-সাঁওতালের উপাস্য দেবতা চাঁদবোঙা-সিংবোঙাকে (চন্দ্র-সূর্য) তিনি স্মরণে রাখেননি। তাই তিনি যখন ভারতের প্রকৃত ধর্মের সন্ধান পান একেশ্বরবাদের মধ্যে, তখন সেই ভারতে কোল-ভীল-মুণ্ডা-সাঁওতালের স্থান হয় না। দয়ানন্দ সরস্বতীও একইভাবে আর্য ভারতের কথা প্রচার করতে গিয়ে এক সীমাবদ্ধ জগতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন, যে জগতে দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবেশের ছাড়পত্র পায়না। থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি অদৃশ্য মহাত্মা এবং গুহ্য রহস্যবিদ্যার উপর নিজেদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে যত্নবান হন—যেখানে যুক্তিনিষ্ঠা, মননশীলতা এবং স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু সীমাবদ্ধ চিন্তা ও চেতনায় আবদ্ধ এসব কি কখনও ভারত-ধর্ম হতে পারে? তাঁরা ভুলেই গেলেন, এই ভারতবর্ষের স্বরূপ, ভুলে গেলেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা।

সেই জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের। তিনি এলেন, শোনালেন সেই বেদ-উপনিষদ এবং রামায়ণ-মহাভারতের ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষের কথা। গ্রাম নিয়েই দেশ, গ্রামের সংস্কৃতি এবং জীবনই দেশের সংস্কৃতি এবং জীবন। তাই গ্রামের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম্য ভাষায় ভারত-ধর্মের কথা শোনালেন। শাস্ত্র পড়েননি, কিন্তু যা বলেছেন, সব শাস্ত্রেরই কথা। তিনি স্বীয় মনন এ জীবন দিয়ে দেখালেন, শুধু একেশ্বরবাদ-অদ্বৈতবাদকে নিলেই চলবেনা, বুঝতে হবে লোকধর্মগুলিকেও। লোকধর্মকে বাদ দিলে লোকজীবনের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি বললেন, মিছরির ছুরি, তা তুমি যেভাবেই খাওনা কেন, মিষ্টি লাগবে। বললেন, ঘাটে সবাই জল নিচ্ছে, কেউ বলছে জল, কেউ বলছে ওয়াটার, কেউ বলছে পানি, কেউ বলছে অ্যাকোয়া। বারোজনে বারোরকম নাম বলল, কিন্তু জলতো সেই জলই। সেকালের

প্রচারিত এবং ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মজগতের ধ্যান-ধারণাকে তিনি ভেঙে চুরমার করে দিলেন। কিন্তু কাউকে বর্জন বা অস্বীকার করলেন না, যাকে তিনি ভেঙে চুরমার করে দিলেন, তাকেও বললেন না মিথ্যা।

বরং তিনি সত্যকে শুধু নিজে উপলব্ধি বা অনুভব করলেন না, সেই সঙ্গে উপলব্ধ সতকে নিজের জীবনে পরীক্ষা করেও দেখালেন। অর্থাৎ উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য থেকে আসা যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে হল অবনত। বিজ্ঞান যেমন পরীক্ষা-নির্ভর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ধর্মও তেমনি পরীক্ষা-নির্ভর এবং প্রমাণিত সত্য। হিন্দুধর্মে তন্ত্র, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি যত শাখা আছে, যতরকম সাধন আছে, সবই তিনি স্বীয়জীবনে অবলম্বন করেছেন, পূর্ণ করেছেন। কিন্তু সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, তিনি একজন গোঁড়া মুসলমানের মত ইসলাম ধর্মের সাধনাও করেছেন—যার তুলনা বিশ্ব-ইতিহাসে নেই। সাধন পথেই অনুভব করেছেন খ্রীস্টধর্মের স্বরূপকেও। এও কি হয়? উনবিংশ শতক হল বিস্ময়ে বিমুগ্ধ।

উনবিংশ শতকের একদিকে যেমন বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব, অন্যদিকে খ্রীস্টান পাদ্রিদের সংঘবদ্ধ অভিযান—এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন। ধর্মও যে বিজ্ঞান—সেটা প্রমাণ করলেন তিনি স্বীয়জীবনে। আর নিজেই খ্রীস্টধর্মের সাধনাকে প্রতিফলিত করলেন নিজের জীবনে। সকল ধর্মের মূল সত্য তাঁর কাছে হল প্রতিভাত। তাঁর কণ্ঠে তাই সর্বজীবের মুক্তির মন্ত্র হল ধ্বনিত।

সেবার যদু মল্লিকের বাগান বাড়িতে গেছেন তিনি। সেখানে গিয়ে একটা ছবির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধনেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিটি হচ্ছে: মা মেরির কোলে যিশু। সেই ছবি দেখে তাঁর ভাবসমাধি হল। নিজের সঙ্গে যিশুর অভিন্নতা উপলব্ধি করলেন তিনি এবং একসময় নিজেই বললেন: যিশু হচ্ছেন ঈশ্বরের অবতার।

সকল সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি এবং সীমাবদ্ধতাকে দূর করতেই যেন

তাঁর আবির্ভাব। তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যের মত হাতে কলমে প্রমান করে দেখালেন, একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈত বাদকে বুঝলেই ধর্মকে বোঝা হয় না; ভারতকেও দেখা যায় না। ভারতকে দেখতে হলে এবং ধর্মকে বুঝতে হলে এই বিরাট দেশের গণধর্মগুলিকেও বুঝতে হবে। কারণ, এই লৌকিক ধর্মের মধ্য দিয়েই জনজীবনের সুখ-দুঃখ এবং আশা-নিরাশার চিরন্তন ধারা প্রবাহিত। একজন ধর্মনায়ক যখন উপাসনার বেদিতে বসে শুধু একেশ্বরবাদের কথা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর পক্ষে অরণ্য-পর্বতে ধ্বনিত আদিবাসী মাদলের শব্দে ঘোষিত লোকধর্মকে অনুধাবন করা সহজ হয় না। আদিবাসী মেয়েদের টুসু গান, কিংবা গ্রাম-প্রান্তে গৃহস্থ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত তুলসী গাছের তলায় বেদিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ—সে তো এই ভারতের মহাজীবনেরই সার্থক প্রকাশ।

উনবিংশ শতকের ধর্ম-আন্দোলনে যে অপূর্ণতার ছায়া প্রলম্বিত ছিল, তা পূর্ণ করতেই যেন নিরক্ষর ভারতের প্রজ্ঞাস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। গ্রাম থেকেই এলেন তিনি শহরে, কথা বললেন গ্রামের ভাষায়—কিন্তু যা বললেন, তা শাস্ত্রেরই কথা, ভারত-আত্মার বাণী। তিনি দেখালেন, ভারত-সংস্কৃতি কেবলমাত্র আর্য সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যুগ যুগ ধরে যে দ্রাবিড় সংস্কৃতি এদেশের মানবজীবনকে বিকশিত করেছে—তাকে বাদ দিলে সেটা হবে অপূর্ণতা। এখানেই শেষ নয়। তিনি প্রমাণ করলেন, মিস্টিসিজম বা গুহ্য-বিদ্যা সনাতন ধর্মের এক খণ্ডচিত্র। কিন্তু বিচারনিষ্ঠা, যুক্তি এবং মননশীলতাকে বাদ দিয়ে সেই খণ্ডচিত্রকে চোখের সামনে রাখাটা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাতে বাধ্য। শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন—এই শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন তাঁরই ভাববাহী নরেন্দ্রনাথকে এবং নরেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব-জাতিকে। প্রথমে শ্রবণ—কান পেতে শুনতে হবে অপরের কণ্ঠস্বর। কে কী বলছে বা কে কোথায় কী বলেছে—সবই জানতে হবে। এই জানাটাই জীবনের লক্ষণ। যুগের পর যুগ মানুষের বিবর্তনের

ধারায় কত মানুষ কতভাবে তাঁদের উপলব্ধ সত্যের কথা বলে গেছেন। সে সব না শোনা, সে সব না জানা ইতিহাস-বিরোধী মানসিকতা। শ্রবণের পরবর্তী ধাপ মনন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সন্তান নরেন্দ্রনাথকে বলছেন: আমি যা বলছি, তা না বুঝে মেনে নিবি না, যদি যুক্তি-বিচার করে সেটাকে গ্রহণীয় বলে মনে করিস, তবেই গ্রহণ করবি। এই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ —যিনি শেখালেন, যা শুনছ যা শুনেছ, তা বিনাবিচারে মানবে না। বিচার করে বুদ্ধির সহায়তায় সেগুলির তাৎপর্য বুঝতে হবে এবং তারপরেই মানবে। এ ভাবেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। মানুষ নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হবে। সর্বশেষে নিদিধ্যাসন। সবকিছু শোনার পর যুক্তি বিচারের সাহায্যে একজন মানুষ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—সেই সিদ্ধান্তকে রূপায়িত করতে হবে নিজের জীবনে। উপলব্ধির অত্যুজ্জ্বল আলোয় প্রতিষ্ঠিত হবেন সত্যস্বরূপ ভগবান।

এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য এবং অনন্যতা। যাগ-যজ্ঞ-নির্ভর এবং পুরোহিত তন্ত্রের হাতে বন্দী হিন্দু ধর্মকে শোধন করতে যে ব্রাহ্ম ধর্মের জন্ম হয়েছিল—তার মধ্যে এই যুক্তি বিচারের স্থান ছিলনা, ছিলনা বলেই প্রথম থেকে দেখা দিয়েছিল স্ববিরোধিতা। আর্য-সমাজও মনন ও নিদিধ্যাসনের পর্বটিকে করেছিল অস্বীকার। আর থিয়োজফিস্ট আন্দোলন—সেওতো বিচার-বর্জিত। খ্রীষ্টধর্মের আগ্রাসী ক্ষুধা থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হলে যে শুধুমাত্র উপাসনা এবং গুহ্য বিদ্যাকে সম্বল করলে হবে না, চাই বিচার-বুদ্ধি ও মুক্ত-বুদ্ধি—সেটাই প্রমাণিত হয়েছে ইতিহাসের ঘটনাধারায়। প্রমাণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আমরা আগেই বলেছি, এই দেশের বুকে প্রসারিত খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য "হিন্দু পুনরভ্যুত্থান" ঘটেছিল। ইংরেজি শিক্ষিত কিছু সংখ্যক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নতুন করে

হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। এঁদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত ইংরেজী শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য ও প্রচেষ্টা জনজীবনের একাংশের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দু কলেজের একজন সেরা ছাত্র এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের বন্ধু হয়েও উনবিংশ শতকের সেই ইয়ং বেঙ্গলের গড্ডালিকা স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও ছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং বিশিষ্ট পদার্থবিদ। তিনি প্রকাশ্যেই হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, বর্ণাশ্রম ধর্মের উপকারিতা, ব্রাহ্মণ-গৌরব, আহারাদি ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুদের বাছ বিচারের যৌক্তিকতা সমর্থন করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন, তা অনেক সময় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা বলে মনে হতে পারে।

এ ব্যাপারে ভূদেব মুখোপাধ্যায় অনেক বেশি পরমত-সহিষ্ণু ছিলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা ও নব্য হিন্দু-ধর্ম প্রচারও সে যুগে "হিন্দু পুনরভ্যুত্থান" আন্দোলনকে বিশেষ গতিময় করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা বিপিনচন্দ্র পালের নামও স্মরণ করতে পারি—যিনি ডার-উইনের মতবাদে "ব্যষ্টির" চেয়ে "সমষ্টির" স্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আবিষ্কার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র "ধর্মতত্ত্ব" (১৮৮৬) গ্রন্থে ঈশ্বর-ভক্তির পরেই দেশ-প্রীতিকে গুরুতর ধর্ম আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্যাখ্যা স্বরূপ তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, এইজন্য সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ।" বঙ্কিমচন্দ্রের মূলকথা আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা ও স্বজন রক্ষা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই মানসিকতা স্থিতিবাদী তত্ত্বের পরিপোষক। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও দেশাচার বা লোকাচারকে স্বীকার করেননি, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি স্থিতিবাদকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই

"স্বধর্ম প্রীতি" ও "আত্মরক্ষা-সমাজরক্ষার" নীতি খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব ও পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্রাহ্ম-ধর্মের সমাজ সংস্কারের গতিকে কিছুটা প্রতিহত করতে পেরেছিল। "হিন্দু পুনরভ্যুত্থান" আন্দোলনের এটাও একটা সাফল্য।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা ঘটনাকেও স্মরণে রাখতে হবে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্য পণ্ডিতও ভারতের অতীত জ্ঞান-গরিমা আবিষ্কার করে হতাশায় ম্রিয়মাণ এবং আত্মবিস্মৃত দেশে হিন্দু জাগরণে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন। মোক্ষ-মূলরের "ঋগ্বেদ ভাষ্য" এবং "ভারতবাসী আর্যজাতির বংশধর" উক্তি সে যুগে নতুন আবেগের সৃষ্টি করেছিল। সেই সঙ্গে প্রিন্সেপ ও কানিংহামের ভারতীয় কলাবিদ্যা, প্রত্নবিদ্যা প্রভৃতি পুনরাবিষ্কারের পথ ধরে কয়েকজন বাঙালী ঐতিহাসিকও নতুন বিশ্বাসে এগিয়ে আসেন। কিন্তু এই নব্য হিন্দুয়ানি শেষ পর্যন্ত শূন্যগর্ভ আস্ফালনে পর্যবসিত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "এই নব্য হিন্দুয়ানিই আমার কাছে অসহ্য। কেননা তার মূলে কোনরূপ সরল বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যে নেই, তার প্রমাণ নব্য হিন্দুরা তাঁদের মত খাড়া করবার জন্য একবার যান দৌড়ে স্পেন্সারের কাছে, আর একবার শঙ্করের কাছে···। এই মানসিক কাপুরুষতা যেমন কমিক, তেমনি ট্র্যাজিক" ('সবুজপত্রের ডাক' প্রবন্ধ, দেশ ১৩ কার্তিক, ১৩৬৬)।

"হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের" ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। অনেক ব্রাহ্ম নেতাও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের অসারতায় ভক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের শেষ জীবনে ভক্তিবাদের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তার বীজ তাঁর জীবনেই নিহিত ছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও শেষ পর্যন্ত গৌর-ভক্তিবাদের স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি গুরুবাদ, অলৌকিকতাবাদ, জাতিভেদ প্রভৃতি সব মেনে নিয়েছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিপিনচন্দ্র

পালও অবশেষে বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। অবশ্য তিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দের পথই মনেপ্রাণে অনুসরণ করেন।

"হিন্দু পুনরভ্যুত্থান" আন্দোলন কিংবা "ভক্তিবাদ" শেষ পর্যন্ত স্ব স্ব সীমাবদ্ধতার জন্য জনজীবনে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। সেই শূন্যতা পূরণ করে ভক্তি ও রসসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ চিনিয়ে দিলেন প্রকৃত ভারতধর্মকে। ভারতের নবজাগরণের পথও যেমন তিনি তৈরি করে দিয়েছেন, তেমনি ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণও তাঁরই জীবনে প্রতিফলিত। তাঁর আচার-আচরণ ও জীবনচর্যার মধ্যে যে অসাধারণ ভক্তিভাব ফুটে উঠত, তা' সমসাময়িক মানুষকে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল।

এই প্রসঙ্গে আমরা "টাইমস অব ইণ্ডিয়ার" (২২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬) একটি উক্তিকে স্মরণ করতে পারি। কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী ওই পত্রিকা সেদিন লিখেছিল : "ঋষি রামকৃষ্ণ হলেন সেই ধর্মাচার্য যাঁর শিক্ষা ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মনকে খুব বেশিভাবে প্রভাবিত করে। যে সর্বজনীনতার ভাব ব্রাহ্ম ধর্মের মূল বস্তু, তাকে উক্ত বিরাট ব্রাহ্ম নেতার (কেশবচন্দ্রের) জন্য গড়ে দিয়েছিলেন ঋষি রামকৃষ্ণ।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সে যুগের সমাজজীবনে যেমন ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়, তেমনি গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। তার কারণ, তিনি চোখে আঙুল দিয়ে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে চিনিয়ে দিলেন প্রকৃত ভারতকে, ঘরছাড়া বালককে ফিরিয়ে দিলেন তার মাতৃ পরিচয়। জাতীয় জীবনের গভীর থেকে উদ্ধার করলেন আত্ম-সত্তাকে। বললেন, এইসব নিয়েই ভারত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের ধর্ম আন্দোলনের সংশয়দীর্ণ ইতিহাসে আরেকটি প্রশ্নের সরল সমাধান দিয়ে গেছেন। উনবিংশ শতকের সেই উষাকালে সাকার-নিরাকার এবং সগুণ নির্গুণ নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। ব্রাহ্মরা ইসলামীয় ধারায় নিরাকার

উপাসনা করতেন আর পূজাকে বলতেন পুতুল পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করলেন, সাকার ও নিরাকার অভিন্ন। যে নির্গুণ, সেই তো সগুণ—যেমন জল আর বরফ। দুইয়ের স্বরূপই এক। জল জমেইতো বরফ হয়, আবার বরফ গলেই জল। তিনি বললেন, সাধারণ মানুষ ধরা ছোঁয়ার জিনিস চায়। তাই ভক্তির জন্য চাই বরফ—অর্থাৎ, সগুণ আকার মূর্তি। আবার জ্ঞান-সূর্যের তাপে বরফ গলে গিয়েই জল হয়। যখন জ্ঞানের পথে যাই—বিচার বিতর্ক করি, নেতি নেতি বলি, তখন নিরাকার বা নির্গুণে পৌছই।

আমরা দেখি, শুধু ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান পুরুষদেরই নয়, শুধু ডিরোজিওর সেই "ইয়ং বেঙ্গলেই" নয়, শুধু হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নায়কদেরও নয়, তিনি তোতাপুরীর মত অদ্বৈত বেদান্তীকে, কট্টর জ্ঞান-মার্গীকেও মাতৃসাধনায় ফিরিয়ে আনতে সফল হয়েছিলেন। এখানেই শুরু হয়েছিল ভাববিপ্লব—যে বিপ্লব ভারতের নবজাগরণ ঘটিয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : আমার আচার্যদেব যে সম্পদ দিয়ে গেছেন, তা' আমি সারা পৃথিবীকে বিলিয়ে দিয়ে গেলাম ; পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ এ নিয়ে ভাববে, চিন্তা করবে। পাঁচ হাজার বছরের জন্য পৃথিবীর মানুষকে চিন্তার খোরাক শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে গেলেন।

প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মত সত্যদ্রষ্টা ঋষি যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, তার প্রকাশ কি আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করছি না? কোথায় হারিয়ে গেল ব্রাহ্মধর্ম? এক শতাব্দীর ব্যবধানে সবকিছুই আজ ইতিহাসের ছিন্নপত্রে স্থান পেয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যন্তরেই দেখা দিয়েছে স্ব-বিরোধিতার বীজ। থিয়োজফিষ্ট আন্দোলন বা আর্যসমাজ —সেওতো বিস্মৃত প্রায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ভারতকে প্লাবিত করে আজ বিশ্বজয় করতে উদ্যত। এই আন্দোলনের একমাত্র অস্ত্র : প্রেম, ভালোবাসা। সকল মানুষের প্রতি অনন্ত, অপার প্রেম।

সমাজ বিপ্লবের পুরোধা শ্রীরামকৃষ্ণ
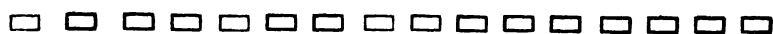
আজকের কামারপুকুর নয়। আজ থেকে দেড়শ' বছর আগের কামারপুকুর গ্রাম। এখন কলকাতা থেকে তিন ঘণ্টায় যাওয়া যায়, সেদিন দুর্গম পথ পার হয়ে ওই গ্রামে যেতে লাগত তিনদিন তিন রাত্রি। সেই গ্রামের একান্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধর।

গদাধরের ধাত্রী মা ধনী কামারনী—সমাজের এক অন্ত্যজ পরিবারের গৃহবধূ। গদাধর তাঁকে 'মা' বলে ডেকেছিলেন। সেই ডাক শুনে ধনী কামারনী পরিহাস করে গদাধরকে বলেছিলেন: এখন মা, মা বলছিস, কিন্তু যখন তোর পৈতে হবে—তখন সেখানে এ মা ঢুকতেও পারবে না। তখন নিজের মায়ের হাত থেকে ব্রতভিক্ষা নিবি—আমার কথা মনেও থাকবে না।

একথা শুনে সেদিনের সেই শিশু তাঁর ধাত্রীমাকে কথা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, আমি প্রথম ব্রতভিক্ষা তোমার হাত থেকেই নেব। কথা দিলাম।

এরকম কথাতো শিশুবয়সে কতজনই কতজনকে দেয়—কিন্তু তা' শুধু কথার কথাই হয়ে থাকে। ধনী কামারনীও তাই ভেবেছিলেন। হয়ত বা, শিশু গদাধরের কথায় হেসেওছিলেন।

তারপর যখন সত্যি উপনয়নের দিন এল, ক্ষণ উপস্থিত হল ব্রতভিক্ষা গ্রহণের, তখন সেই শিশু গদাধর মাথা তুলে বললেন, "আমি আমার ধাত্রীমা'র হাত থেকে প্রথম ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করব।"

একথা শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, ভাবলেন, বোধহয় শিশুর

খেয়াল। সবাই বললেন, তা' হয় না। প্রথম ব্রতভিক্ষা নিতে হবে নিজের মায়ের হাত থেকে। সেটাই নিয়ম।

কিন্তু গদাধরের এক কথা। সেই এক কথা : আমি কথা দিয়েছি। আমি সত্যভঙ্গ করতে পারি না কিছুতেই। কী দৃপ্ত সাহস তাঁর। গোটা পরিবার, গোটা সমাজ একদিকে, আর একদিকে একটি বালক।

প্রথমে বোঝালেন সবাই। দাদা বোঝালেন, মা বোঝালেন—একে একে সবাই বোঝালেন। কিন্তু কোন কিছুতেই বুঝতে রাজি নন তিনি। তখন সবাই ভয় দেখালেন, হুমকি দিলেন, দেখালেন রক্তচক্ষু। সব নিষ্ফল হয়ে গেল।

সেই এক কথা : সত্যভঙ্গ করতে পারি না। আমি তাঁকে মা' ডেকেছি, তাঁকে কথা দিয়েছি।

শেষ পর্যন্ত সবাই নতি স্বীকার করলেন সেই বালকের কাছে—পরবর্তী কালে যাঁর কাছে নতি স্বীতার করেছে সমগ্র দেশ। ধনী কামারনী এলেন মাতৃত্বের গৌরবে সেই ব্রহ্মচারার সম্মুখে। দিলেন ব্রতভিক্ষা। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়ের।

জীবনের ঊষালগ্নেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ-বিপ্লবের মহাবীজ বপন করেছিলেন নিজের জীবনে এবং জাত-গোত্রের কৃত্রিম বন্ধন ছিন্ন করার পথ ও পদ্ধতি দেখালেন তিনি নিজের জীবনে। একেই তো বিপ্লব বলে। সমাজ রূপান্তরের কথা শুধু মুখে মুখে নয়, শুধু বচনে এবং ভাষণে নয়, শুধু তত্ত্বগর্ভ প্রবন্ধে নয়—তার প্রকাশ যখন ঘটে ব্যক্তিজীবনে, তখনই সেটা সত্যমূল্যে হয় প্রতিষ্ঠিত। যেমন হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে।

সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতি করার ব্যাপারে তিনি যে ঐতিহাসিক ভাব-বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, সেটা আমরা সহজ চোখেই দেখতে পাই। একদিকে যখন অন্তঃসারশূন্য ব্রাহ্ম আন্দোলন শুধুমাত্র স্ববিরোধিতার অস্থিরতায় অচল ও স্থবির হয়ে পড়ল, অন্যদিকে তখন

প্রায় নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-প্রবাহ আমাদের জড়তাগ্রস্থ সমাজ দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল।

ইতিহাসের পাতায় বারবার আমরা দেখেছি, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে ভাব-বিপ্লব! রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাবলী—যা' সে যুগের সে দেশের নির্যাতিত ও নিষ্পীড়িত মানুষের জীবনে নতুন আশা-ভরসার প্রেরণা হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের আগেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। রুশো আর ভলতেয়ারের অগ্নিগর্ভ লেখা মানুষের প্রাণে প্রাণে মনে মনে নতুন সংকল্পের বার্তা পেঁাছে দিয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করেছে মানুষের সম্মানবোধ এবং আত্মবিশ্বাস। ওই ভাবের জোরেই তৈরি হয়েছে বিপ্লবের পথ। চীনা-বিপ্লবের আগেও সেই সান ইয়াত সেনের বাণী মন্ত্রের মত কাজ করেছিল। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রবিপ্লব সংগঠিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু পরাধীন জাতির বুকে নতুন আশার বাণী এবং স্বাধীনতার আকাঙ্খা হয়েছিল সঞ্চারিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরবর্তী যুগেই স্বাধীনতার দাবি যেমন লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে, তেমনি স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের সংকল্পও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাঙলাদেশের মাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। আর এখান থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা। পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ এবং ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুদার এক শ্রেণীর ভারতবাসীর সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন জগতের দ্বার খুলে দিলেন। পাশ্চাত্য শুধু নয়, ভারতও বিশ্বকে দিতে পারে অনেক কিছু। হাত পেতে গ্রহণ নয়, হাত তুলে দেওয়ার ক্ষমতাও আমাদের আছে। এই বোধ যখন এল, তখনই ফিরে এল আত্মবিশ্বাস। জাগ্রত হল আত্মশক্তি।

আর সেই আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তির জীবন্ত মূর্তি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি দেশকে ডাক দিলেন: আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য দেশই একমাত্র আরাধ্যা। যুবকদের ডাক দিলেন:

তোরা সব মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। অভয়বাণী শোনালেন: ভারতবর্ষ 'আবার জাগবে, তবে জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে।" প্রকৃতপক্ষে চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলন জয় করে যখন স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে এলেন, তখনই ভারতের নতুন প্রাণশক্তির জাগরণ ঘটতে শুরু করেছে। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম শোনালেন: ভারতবর্ষ একটি দেশ এবং এক জাতি। ১৯০৫ সাল থেকে ভারতবর্ষে যে বিপ্লবের সূচনা হল--তার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। সেই বাণীর মূর্ত বিগ্রহরূপে দেখা দিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং বিপ্লবী অরবিন্দ।

একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, কামারপুকুরের সেই গদাধর এমন এক ভাববিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, যার অনিবার্য এবং অবধারিত পরিণামে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন অধ্যায় হল যুক্ত।

এতো গেল একদিকের ঘটনা, অন্যদিকেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব অনন্যসাধারণ। সে যুগে ডিরোজিও সাহেবের ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের ফল আমা জানি। তাঁব মৃত্যু হয় ১৮৩১ সালে। তার আগেই তিনি নব্য বাঙ্গালী যুবকদের রীতিমত বুদ্ধিজীবী করে তুলেছিলেন। সেই অবিশ্বাসী যুবকদের এমনই যুক্তিবাদী করে তুলেছিলেন তিনি যে, তাঁরা বলতে শুরু করেছিলেন, আমরা ধর্ম, ঈশ্বর ও পরলোক মানিনা। তাঁদের বিচারবুদ্ধি ক্রমান্বয়ে নাস্তিক্যবুদ্ধির জন্ম দিতে শুরু করল—যার ফলে তাঁরা মা কালীকেও "ম্যাডাম" বলে সম্বোধন করতে শুরু করলেন এবং নিষিদ্ধ ভক্ষণে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হয়, কিন্তু তার আগেই তিনি যা করার করে গেছেন।

তার ঠিক পরেই দেখা দিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব! দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রবর্তন করলেন, বের করলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে সে যুগের খ্রীস্টান

মিশনারিদের সঙ্গে প্রকাশ্যে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, প্রমাণ করতে উদ্যত হলেন যে, খ্রীস্টধর্মের তুলনায় বৈদিক ধর্ম অনেক ভালো। এ প্রসঙ্গে অবশ্য আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, তবু এখানে পরিস্থিতি অনুধাবনের প্রয়োজনে পূর্বসূত্র অনুসরণ করতে চাই।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ডিরোজিও সাহেব, ডাফ সাহেব বা দেবেন্দ্রনাথ—সকলেই সে যুগের সমাজ এবং যুবকদের প্রভাবান্বিত করার জন্য দল গড়লেন এবং নানারকম পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের পিছনে কোন দল ছিল না, কোন গোষ্ঠী ছিল না, কোন পত্রিকা ছিল না এবং তিনি কোন পুস্তিকাও প্রকাশ করেননি। বরং সে যুগের হিন্দু সমাজের প্রধানরা নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্যঙ্গ করেছেন। এমন একজন মানুষ নিজের ধর্মকে বড় করার জন্য কোন ধর্মকে ছোট করলেন না, বললেন না, তোমারটা খারাপ, আমারটা ভালো। তিনি কারো সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হননি, কাউকে আঘাত করতেও উদ্যত হননি। বললেন, মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ। আর বললেন, যত মত, তত পথ।

এর চাইতে বড় বিপ্লবাত্মক পথ আর কি হতে পারে? প্রচলিত সব ধ্যান-ধারণা, সব অজ্ঞানতা ও সঙ্কীর্ণতাকে ভেঙে চুরমার করে দিলেন তিনি, দেখালেন নতুন পথ, সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ। তাঁর মধ্যে কোন অস্বীকৃতির কথা নেই, কোন নেতিবাচক কথা নেই এবং যে মতবাদকে তিনি ভেঙে চুরমার করে দিলেন, তাকেও তিনি মিথ্যা বললেন না। হিন্দুধর্মের সকল মত ও পথের সাধনা করলেন তিনি। ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের সর্বাত্মক সাধনা করলেন তিনি। তারপর সকল ধর্মের সত্যকে উপলব্ধি করলেন। মুখের কথায় নয়, তিনি নিজে আগে জীবনে স্বধর্মে পরিণত করলেন পরধর্মকে, সবকিছুকে পরীক্ষা করলেন, তারপর সেই পরীক্ষিত সত্য তুলে ধরলেন বিশ্ববাসীর

কাছে। সেইজন্যই তাঁর কথার মধ্যে ছিল, বৈজ্ঞানিক সত্যের স্পষ্টতা এবং বৈপ্লবিক ধর্মের স্বচ্ছতা।

এই পৃথিবীতে ধর্মনায়ক এসেছেন বারবার, অবতারের আবির্ভাবও ঘটেছে বারবার। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে একটা নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন, তেমন আর কখনও দেখা যায়নি। অবশ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করলে শ্রীচৈতন্যকেও একটা বিশেষ যুগের প্রবর্তক বলা যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সর্বগ্রাসী এবং সর্বমুখী—তেমন আর কেউ নন। তিনি সত্যসাধনের মাধ্যমেই সত্যে উপনীত হয়েছেন। অথচ এভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রহণ এবং আচরণ না করেও তিনি যদি বলতেন, ইসলামধর্ম সত্য, যদি বলতেন, যীশু ঈশ্বরের অবতার, তাহলে তাঁর কথা সবাই মেনে নিতেন মাথা পেতে। তিনি কিন্তু সেই চিরাচরিত পথে গেলেন না। নিজে সকল ধর্মের মূল সত্যকে নিজের জীবনে অনুভব করলেন, তারপর সকল ধর্মের সারতত্ত্ব প্রতিফলিত হল তাঁর অমৃতজীবনে এবং তখনই তিনি শাশ্বত-সত্যের প্রবক্তা বলে গৃহীত হলেন। সেইজন্যই তিনি হচ্ছেন নবযুগের স্রষ্টা মুক্তবুদ্ধির দিশারী।

তাই তিনি কত সহজে সেকালের বহুনিন্দিত "কৈবর্ত্য" বাড়ির পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছিলেন। শুভকাজে বিধবার অধিকার নেই এবং অধিকার নেই "নিচজাতির" কোন মহিলার—এই সংস্কারের মূলে তিনি নিছক বাক্যবান দিয়ে আঘাত করেন নি, আঘাত করেছিলেন স্বীয় জীবন ও কর্ম দিয়ে। রাণী রাসমণির পৌরোহিত্য গ্রহণ করে তিনি যেমন সেযুগে হিন্দুসমাজের বহুজনের কাছে নিন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি হাসিমুখে সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে "যত্র জীব তত্র শিব" মন্ত্রকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিপ্লব আবার কাকে বলে? সামাজিক কাঠামোর দ্রুত রূপান্তর যদি বিপ্লব হয়, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের চাইতে বড় বিপ্লবী আর কে ছিলেন?

তিনি তত্ত্বকথা দিয়ে বিপ্লবের দেহে রঙ চড়াননি—এটা যেমন সত্য,

তেমনি সত্য হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে একটার পর একটা কাজ করে বিপ্লবের মূলধর্মকে পালন করেছিলেন। তাই আমরা দেখি, সংস্কার মুক্তির নামে যে ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেই ব্রাহ্মধর্মের নায়ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জন্মগত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তা' পারেন নি বলেই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে বরণ করতে ছিল তাঁর ঘোর আপত্তি। কারণ, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মণ নন। আর তার ফলে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

অন্যদিকে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ কত সহজে কায়স্থ সন্তান নরেন্দ্রনাথ দত্তকে সন্ন্যাস দান করে এক নবযুগ এবং নবভাবনার প্রবর্তন করেন। প্রচলিত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সংস্কারের গণ্ডীতেই ছিল তাঁর সংসার। অথচ হিন্দুধর্মের প্রচলিত সংস্কারকে ভেংঙে চুরমার করতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী একমাত্র ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অধিকারের পরিধি প্রসারিত করে দিলেন অব্রাহ্মণের দিকেও। এটা যদি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ না হয়, তাহলে বিপ্লব কাকে বলে? শুধু একমাত্র তাঁর স্নেহের দুলাল নরেন্দ্রনাথ দত্তকে সন্ন্যাস দিয়েই তিনি দায়িত্ব শেষ করেন নি। একের পর একজনকে সন্ন্যাস দিয়েছেন। রাখাল বাবুরাম এবং শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র দত্তের গৃহভৃত্য লাটু— সকলেই তাঁর হাতে পেয়েছিলেন সন্ন্যাসের অধিকার।

শুধু সন্ন্যাস দেওয়াই নয়, তিনি তাঁর নির্বাচিত সন্তানদের সামনে এমন এক পথ তৈরি করে দিলেন, যা, ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। নরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন তার কাছে এলেন, তিনি তখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন: কী চাস তুই আমার কাছে? উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: আমি মোক্ষ চাই। শুকদেবের মত শুধু আনন্দে ডুবে থাকতে চাই। এই উত্তর শুনে যে কোন ধর্মগুরুরই আনন্দিত হওয়ার কথা। কারণ, তিনি এমন

একজন শিষ্য পেয়েছেন, যিনি আধ্যাত্মিক সাধনার শেষস্তরে পৌঁছে যেতে যান। অথচ, এই উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত হওয়া দূরের কথা, বরং বিরক্ত হলেন, বললেন, ধিক্ তোকে। কোথায় তুই একটা বিরাট বটগাছের মত হবি। তোর ছায়ায় কত মানুষ এসে শান্তি পাবে, আশ্রয় পাবে, মুক্তি পাবে—তা' নয়, তুই স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তি চাইছিস।

শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ খুলে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের। তাই পরবর্তীকালে স্বামীজী বলছেন, যতক্ষণ ভারতের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি আমার মুক্তি চাইনা। ধর্মজগতের ইতিহাসে, কিংবা সমাজ বিবর্তনের গতিপ্রকৃতির ধারায় এরকম যুগান্তকারী ঘটনা আর কটা আছে? প্রচলিত অর্থে রামকৃষ্ণদেব সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন না—এটা ঠিক, কিন্তু তিনিই একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সমাজবিজ্ঞানীর মত এক নতুন সত্য অনুভব করেছিলেন। ধর্ম একটা সামাজিক শক্তি। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের কল্যাণ এবং ব্যাপক অর্থে সমাজের রূপান্তর ঘটানো যায়। সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে ধর্ম। তাই সেই পথেই তিনি পরিচালিত করলেন স্বামী বিবেকানন্দকে, যিনি মর্মে মর্মে সেই পরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, সকলের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তির সার্থকতা নেই।

আগে যে কথা বলেছি, সে কথার সূত্র ধরে আবার বলছি: সত্যকে ভালো করে পরীক্ষা করে তবেই তা গ্রহণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ধর্ম, সমাজ এবং মূল্যবোধ নিয়ে যে সকল তর্কবিতর্কের ঝড় এবং স্রোত প্রবাহিত হয়েছিলে, তিনি তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। তিনি বরং এসব তুচ্ছ বিতর্কের উর্ধে উঠে সব তর্কের মীমাংসা করে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, সত্য একটি অখণ্ড সত্ত্বা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বর্ণিত সেই বহুরূপীর গল্প আমরা জানি।

চার বন্ধু এক গাছে বহুরূপী দেখেছে। দেখার পর চারজনের মধ্যে বেঁধেছে তুমুল তর্ক। তর্কের বিষয়, বহুরূপীর রঙ কেমন? একজন বলছেন লাল, একজন বলছে নীল, একজন বলছে সবুজ এবং আরেকজন বলছেন বেগুনী। তর্কের আর মীমাংসা হয়না। তর্কের হয়না শেষও। শেষ পর্যন্ত তর্কের মীমাংসা করার জন্য তাঁরা কোন অতিপ্রাজ্ঞ এবং পুঁথি সর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে গেলেন না, গেলেন সেই মানুষটির কাছে, যিনি ওই গাছের নিচেই থাকেন। তাঁর কাছে গেলেন এই জন্য যে, তিনি নিজে ব্যাপারটা দেখেছেন, বইপড়া বা শোনা বিদ্যা নয়।

চারজনের কথা শোনার পর ওই লোকটি বললেন, দেখ, তোমরা চারজনই ঠিক বলেছ। বহুরূপী যখন লাল রঙ ধারন করেছিল, তখন একজন দেখেছে, অন্যজন দেখেছে অন্য রঙ ধারন করার সময়। একটা রঙের সময় একজন দেখেছ—কিন্তু এমনও হয়, যখন বহুরূপীর কোন রঙই থাকেনা। মজার কথা হল, আধুনিক বিপ্লবী ভাষায়, এখানে কোন সিনথেসিস বা সমন্বয়ের কথা বললেন না, বলা হল, ওই চারটি রঙই সত্য। চারটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চারটি ঘটনাই সত্য। বিষয়টা ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই। এমন নয় যে, সব ধর্মের মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে এবং সেই কিছুকিছু সত্য থেকে বেছে নিয়ে একটা পূর্ণ সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বরং বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, সব ধর্মই সত্য। গোটা ধর্মটাই গোটা সত্য। কারণ, সত্য হচ্ছে অখণ্ড সত্ত্বা, অখণ্ড বস্তু। একে টুকরো টুকরো করে সব ধর্মে ছড়িয়ে দেওয়া যায় না, বা সব ধর্ম থেকে আংশিক সত্য কুড়িয়ে নেওয়াও যায় না। প্রত্যেক ধর্মই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংসত্য।

আজ যখন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন উপ-ধর্মের সংঘাত অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তখন সবিস্ময়ে দেখি, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মত এবং পথ আমাদের

সামনে স্থায়ী শান্তির দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। সব ধর্মই সত্য—যত মত তত পথ—এই সত্য যখনই একজন অনুভব করবেন, বা এই সত্যে আস্থাবান হবেন, তখনই অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা হবে জাগ্রত। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সামনে সেই নবযুগের বার্তা বহন করে এনেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেনঃ আমার গুরুদেব যা সম্পদ দিয়ে গেছেন, তা আমি সারা পৃথিবীকে বিলিয়ে দিয়ে গেলাম, 'পাঁচ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ এনিয়ে ভাববে, চিন্তা করবে। বাস্তব অর্থেও তাই।

কামারপুকুরের প্রায় নিরক্ষর গদাধর চট্টোপাধ্যায় সমগ্র বিশ্বের জন্য যে ভাববিপ্লবের বার্তা বহন করে এনেছিলেন, আজ পৃথিবীর সকল প্রান্তে তার তরঙ্গ পৌঁছে গেছে। প্রেম-প্রীতি হারা মানুষ এক আত্মবিশ্বাসহীন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আত্মত্রাণের পথ খুঁজছে। মানুষ দেখেছে, ক্ষমতায় সুখ নেই, শান্তি নেই, দেখেছে ভোগে সুখ নেই, শান্তি নেই, দেখেছে হিংসায় সুখ নেই, শান্তি নেই। তাই, তাঁরা আজ অসহায়ের মত মুক্তির পথ খুঁজছে। শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি নয়, চাই আত্মিক মুক্তিও। রামকৃষ্ণের ভাবতরঙ্গ মানুষকে সেই সার্বিক মুক্তির স্বাদ দিতে পারে। তাই, দেশদেশান্তরে আজ দেখা দিয়েছে এক নতুন সম্ভাবনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের "দ্বিতীয় কেল্লা"

□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□

১৮৯৭ সালের পয়লা মে। বিকেল সাড়ে তিনটা। বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে সেদিন এক নতুন যুগ ও জীবনের উন্মেষ ঘটেছিল। বিশ্ববিজয় করে স্বামী বিবেকানন্দ ফিরে এসেছেন স্বদেশে। সুপ্ত ভারতবর্ষ তারই অমোঘ বাণী আর জয়ধ্বনিতে ফিরে পেয়েছে নতুন জীবনের আশ্বাস। বলরাম বসুর বাড়ির দোতলায় শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যরা সমবেত হয়েছেন স্বামীজীর ডাকে। বিকেলে আলমবাজার মঠ থেকে দৃপ্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এলেন বাগবাজারে। সকলের চোখ তাঁর দিকে। যে সিঁড়ি দিয়ে অন্তত শতবার শ্রীরামকৃষ্ণ ওই বাড়ির দোতলায় উঠেছেন, আজ শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁরই আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে সেই সিঁড়ি ধরেই উঠেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি এসে বিজয়ীর বেশে ঢুকলেন বড় হলঘরে—যে ঘরে তাঁরই অপেক্ষায় বসে আছেন সকলে।

ঘরে এক প্রশান্ত নীরবতা। সকলে উন্মুখ হয়ে আছেন বিবেকানন্দের কথা শোনার জন্য। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে জেগে উঠল বিবেকানন্দের প্রবল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কম্বুকণ্ঠ। তন্ময় হয়ে তিনি সকলের উদ্দেশে বলতে শুরু করলেন: নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।···আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহবসানের বিশ বছরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার

হয়েছে, এই সংঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা এ কাজে আমার সহায় হোন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঋজু কণ্ঠে সমবেত সকলকে এই নতুন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, আর সমাগত সকল মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই বাণীর স্পর্শে সম্মোহিত। শ্রীরামকৃষ্ণই শিখিয়েছিলেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না" শিখিয়েছিলেন, "জীবেপ্রেম" আর শিখিয়েছিলেন "শিবজ্ঞানে জীবসেবার" অমোঘ মন্ত্র। সকল জীবের মধ্যেই শিব আছেন, জীবকে সেবা করেই শিবসেবা। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সেবাব্রত পালনের জন্যই সর্বস্বত্যাগের আমন্ত্রণ জানালেন। জানালেন, সংঘ জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার কথা।

এর আগে বিদেশে থাকাকালীনই তিনি তাঁর গুরুভাইদের কাছে সংঘ গড়ে তোলার নির্দেশ ও কর্মপন্থা পাঠিয়েছিলেন। তারও আগে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে ১৮৮৬ সালের সূচনাতেই অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে নবীন সন্ন্যাসী সংঘের বীজ বপন করা হয়েছিল। পরে আলমবাজার মঠে তারই বিকাশ ঘটে। কিন্তু ১৮৯৭ সালের পয়লা মে পুণ্যবান বলরাম বসুর বাড়িতে ঘটল সেই সংঘ জীবনের পূর্ণ অভিষেক।

সেদিন সমবেত রামকৃষ্ণ শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংঘ গড়ে তোলার ব্যাপারে সংশয় পোষণ করলেও উপস্থিত সকলে এ ব্যাপারে সম্মতি জানালেন। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষও। গৃহীত হল রামকৃষ্ণ-সংঘ স্থাপনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। পরে ৫ মে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় গৃহীত হল সংঘের কার্যপ্রণালী। সংঘের নাম হল, "রামকৃষ্ণ-প্রচার সমিতি" বা রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন। স্বামীজী হলেন প্রচার সমিতির সাধারণ সভাপতি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ হলেন কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও উপ-সভাপতি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্নি হলেন সম্পাদক। ঠিক হল, বলরাম বসুর ওই বাড়িতেই প্রতি রবিবার বিকেল চারটের পর সমিতির অধিবেশন বসবে। সেই প্রথম সংগঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী

জয়যাত্রার শুভলগ্ন। আর এই নতুন তরঙ্গকে নিজের বক্ষে ধারণ করে বলরাম বসুর বাড়িটি এক ঐতিহাসিক লীলাভূমিতে পরিণত।

রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা-ভূমি রচনার কাজটি শুরু হয়েছিল অনেক আগেই, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এসে পদার্পণ করেছিলেন এই বাড়িতে। প্রথম কবে শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম বসুর বাড়িতে এসেছিলেন ? প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। তবে আমরা যদি শ্রীম কথিত "রামকৃষ্ণ কথামৃত"কে অনুসরণ করি, তাহলে দেখব, বলরামেব বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম আসেন ১৮৮২ সালের ১১ মার্চ। কথামৃতকার পরবর্তীকালে (১৮৮৫ সালের ১১ মার্চ) শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাঙ্গন এই বলরাম মন্দিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "আজ আন্দাজ বেলা দশটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া ভক্তগৃহে বসু বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ পাইয়াছেন। সঙ্গে লাটু প্রভৃতি ভক্ত। ধন্য বলরাম। তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নতুন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস মন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন।"

শ্রীম (মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন : দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বসে বসে কাঁদেন, নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন বলে ব্যাকুল। রাতে ঘুম নাই। মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও, মা ওকে এখানে এনে দাও, যদি সে না আসতে পারে, তা'হলে মা আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, বলরামের জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন। যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করতে বলরামকে পাঠান। বলেন, "যাও—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়।"

কথামৃত থেকেই আমরা জানতে পারি, বলরামের বাড়িতেই শ্রীযুক্ত

গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম বসে আলাপ। এখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এইখানেই কতবার "প্রেমের দরবারে আনন্দের 'মেলা' হইয়াছে।"

কথামৃত অনুসারে প্রথম যেদিন পদার্পণ করেছিলেন এই বাড়িতে, সেই ১৮৮২ সালের ১১ মার্চের কৃষ্ণা সপ্তমী সন্ধ্যাকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন: "ধরণী জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত করিয়া আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত না হইলেও বলরামের, গৃহে আজ পূর্ণচন্দ্র শোভমান। চারিদিকে ভক্তগণ। আজ বলরামের আনন্দের সীমা নাই। তিনি যুক্ত করে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছেন ও ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইতেছেন। দেখিলে মনে হয় না তিনিই গৃহস্বামী—যেন "তৃণাদপি সুনীচেন' দীনভাবের মূর্তিমান বিগ্রহ।

সেই প্রথম, কিন্তু তারপর অন্তত শতবার তিনি এ বাড়িতে এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন: দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িকে ঠাকুর কখনও রহস্য করে, 'মা কালীর কেল্লা' বলে নির্দেশ করতেন। আর বলরাম বসুর বাড়িকে দ্বিতীয় কেল্লা বলে নির্দেশ করলে অত্যুক্তি হবে না। কলকাতায় এসে রাত্রি যাপন করতে হলে তিনি এ বাড়িতেই করতেন। রথযাত্রার দিন-গুলিতে তিনি এখানে এসেই জগন্নাথদেবের ছোট রথটিকে টানতেন। ওই রথটি এখনও বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। দোতলার বড় হল ঘরটি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। আর সাক্ষী দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি।

পাথরের সিঁড়ি যদি কথা বলতে পারত, তাহলে প্রত্যক্ষদর্শী সিঁড়ির কণ্ঠে ইতিহাসের অনেক ঘটনাই জীবন্ত হয়ে উঠত আজকের ঐতিহাসিক বা দর্শকদের কাছে।

বলরাম মন্দিরকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বার্তা প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেবেন-এটা যেন পূর্বনির্ধারিত। তা এক অনিবার্য ঘটনারই পরিণাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ অনুসরণে জানতে পারি, এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সাধ হয় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-সংকীর্তন প্রত্যক্ষ করার। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব মহানন্দে সঙ্কীর্তনের আবেগে কীভাবে নগর প্রদক্ষিণ করতেন-সেই দৃশ্য তিনি ভাবাবস্থায় দর্শনও করেন।

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! অসীম জনতা হরিনামে উদ্দাম। হরিনামে সে কি উন্মত্ততা। আর প্রেমানন্দে উন্মত্ত সেই জনতা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবল আকর্ষণে উন্মাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনেত্রে দেখলেন, সেই অপার জনস্রোত ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে পঞ্চবটীর দিক থেকে এসে তাঁরই ঘরের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সেই দৃশ্য দেখে শ্রীরামকৃষ্ণও পরমানন্দে বিভোর।

পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ওই সংকীর্তনসাগরে ভেসে যাওয়া অসংখ্য মুখের মধ্যে কয়েকটি মুখ তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়েছিল। ওই মুখগুলির সবগুলি স্মরণে না থাকলেও স্নিগ্ধ ভক্তিতে অত্যুজ্জ্বল বলরাম বসুর মুখখানি তিনি ভোলেননি। প্রথম যেদিন বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে, সেদিন দু'জনেই দু'জনকে দর্শন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেই চিনেছিলেন, এই সেই লোক, যাকে তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তন শোভাযাত্রায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এই বলরাম বসুর বাড়িই এখন বাগবাজারে 'বলরাম মন্দির' নামে সর্বজন পরিচিত। আগে ঠিকানা ছিল ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রিট। এখন নতুন ঠিকানা ৭নং, গিরিশ অ্যাভেনিউ। ভক্ত-ভৈরব মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়িও ছিল কাছেই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাসঙ্গীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনেত্রে যাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই বলরাম বসুর জন্মও এক বিশিষ্ট ভক্ত পরিবারে। ১৮৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে (বাংলা ২১ অগ্রহায়ণ) তাঁর জন্ম। বলরাম বসুর পিতামহ কৃষ্ণরাম বসুও ছিলেন সে যুগের স্বনামধন্য পুরুষ—যিনি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে নিজের আয় থেকে

লক্ষাধিক টাকা দান করেছিলেন। উত্তর কলকাতার কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রিট তাঁরই অক্ষয় স্মৃতি বহন করছে। এখানেই শেষ নয়। কৃষ্ণরাম কৃষ্ণনগরে ১৫টি জলাশয় ১০টি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রথযাত্রার জন্য বিখ্যাত শ্রীরামপুরের মাহেশ থেকে বল্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা তিনিই প্রথম তৈরি করেছেন। তাছাড়া মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের কাঠের রথ, যেটা এখন লোহার রথে রূপান্তরিত, তিনিই করে দিয়েছিলেন। প্রপিতামহের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল পিতামহের মধ্যেও। পিতামহ গুরুপ্রসাদ বসু বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ বানিয়ে দিয়েছিলেন, যেটি কালাবাবুর কুঞ্জ নামেই পরিচিত। এই কালাবাবুর কুঞ্জে পরবর্তীকালে জননী সারদাদেবী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দ কঠোর তপস্যা করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ স্বগৃহে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদ জীউর পূজা করতেন এবং এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, ওই রাধাশ্যামের নাম থেকেই আজকের উত্তর কলকাতার বিখ্যাত শ্যামবাজার নাম। গুরুপ্রসাদের পুত্র এবং বলরামের পিতা রাধামোহন সংসারবিরাগী মানুষ ছিলেন। বিষয়-চিন্তার চাইতে ঈশ্বর-চিন্তাই তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। তাই সংসার থেকে দূরে গিয়ে বৃন্দাবনে বসে তিনি ঈশ্বরনামেই পরমানন্দের সন্ধান পান।

এই পারিবারিক ধারা এবং ঐতিহ্যকে সম্বল করেই বলরাম বসুর জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ, পূর্বাশ্রমের নাম যাঁর বাবুরাম ঘোষ, তাঁরই বড়বোনের সঙ্গে বিয়ে হয় বলরাম বসুর। আঁটপুরের ভক্তিস্নাত ঘোষ পরিবারের মেয়ে কৃষ্ণভাবিনী শ্যামবাজারের রাধাশ্যাম জীউর সংসারে এলেন সেবিকা হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কৃষ্ণভাবিনী শ্রীমতী রাধার অষ্টসখীর প্রধানা। বলরামের সংসারে মন নেই। কখনও ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় ভদ্রকে নিজের জমিদারিতে একান্তে সময় কাটান, কখনও চলে যান পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রে। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : বলরামের

ভিতর দয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল।

এখন যেটা 'বলরাম মন্দির', সেই ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রিটের বাড়িটি ওই সময়েই কেনেন বলরামের জ্যেষ্ঠতাত 'রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু। তিনি কটকে ওকালতি করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁরই অনুরোধে এই বাড়িতে বলরাম বসবাস করতে থাকেন এবং এই বাড়িতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরমভক্ত বলরাম জগন্নাথ বিগ্রহের সেবা করেই ইপ্সিত সত্যের সন্ধানে ব্রতী হন।

এই সময়েই একদিন তিনি সংবাদপত্রে পড়েন দক্ষিণেশ্বরের আশ্চর্য পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা, লিখেছেন কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্র সেন লিখেছেন, দক্ষিণেশ্বরে এক অপূর্ব মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে—যাঁর মুহুর্মুহু সমাধি হয়, যাঁর অমৃতবচন শুনে শিক্ষিতজনও বিমুগ্ধ। "সুলভ সমাচারে" এই বৃত্তান্ত পড়েই বলরামের মন ছুটে চলে দক্ষিণেশ্বরের পথে।

আসলে এক নতুন সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলরাম বসুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তেমনি বলরামও চাইছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের আশ্রয়ে শতবার আসেননি, বার বার এসেছেন জননী সারদাদেবীও। এ যেন তাঁদেরই আবাস। বলরামকে সারদাদেবী বলতেন রাম। সেই রামের পত্নীর অসুখ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে বললেন, আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না? কিসে যাব? ঠাকুর বললেন, হেঁটে যাবে। শেষ পর্যন্ত পালকিতেই গিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালের ১৩ এপ্রিল বলরাম যখন মৃত্যুর কোলে শায়িত, তখনও তাঁর মাথায় বর্ষিত হয় জননী সারদাদেবীর আশীর্বাদ ও অভয়বাণী।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর থেকেই বলরাম মন্দির রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। সঙ্ঘের প্রথম

সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের অতি আদরের আবাস ছিল এই বাড়িটি। ১৯২২ সালের ১০ এপ্রিল এই বাড়িতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ করেন। এই বাড়িতেই স্বামী প্রেমানন্দেরও দেহাবসান ঘটে।

এই বাড়ির একতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্ময়কর সৃষ্টি স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ) একটানা দশ বছর বসবাস করেন।

এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যরা অনেকেই যেমন থাকতেন, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দও থেকেছেন অনেকবার। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর লেখা 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮৪) গ্রন্থে ১৮৯৮ সালের একটি চমৎকার ঘটনার বিবরণ পাই। তিনি লিখেছেন, 'বলরামবাবুর বাড়িতে স্বামীজী একদিন দুপুরে আহারের পর বিশ্রাম করছেন এবং তাঁর শিষ্য শরৎবাবু পদসেবা করছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠলে স্বামীজীর মনে পড়ল, সেদিন সূর্যগ্রহণ। বিশ্রামের প্রয়োজনবোধকালে, এমনকি অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর কথাবার্তায় সর্বদাই একটা কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষিত হত। আজও স্বাভাবিক কৌতুক ভরে সহাস্যে বললেন, 'গেরণ লেগেছে, এইবার একটু ঘুমুই'। কিন্তু ঘুম কি সহজে আসে? খানিক পরে যখন চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এল, তখন বললেন, 'এই ঠিক গেরণ' —বলেই পাশ ফিরে শুলেন, ঘুমুবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু, কিছুতেই ভাল ঘুম হল না। কিছুক্ষণ পর উঠে বালকের মত শিষ্যকে বললেন, 'লোকে বলে, গেরণের সময় যা করা যায়, তার শতগুণ ফল হয়। ভাবলুম, যদি এই সময় একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যায়, তবে এরপরে হয়ত ভাল ঘুম হবে, কিন্তু তা হবার নয়। মিনিট পনের ঘুমিয়েছি বটে, কিন্তু মা আমার কপালে সুনিদ্রা লেখেননি।'

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়েও এই বাড়ি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ভগিনি নিবেদিতাও এই বাড়িকে কেন্দ্র করেই নিজের কর্মক্ষেত্রকে করেছিলেন প্রসারিত।

ভগিনি নিবেদিতা তখন বাগবাজারে ১০।২, বোসপাড়া লেনের ভাড়া বাড়িতে জননী সারদাদেবীর সঙ্গেই থাকেন। সময়টা ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাস। সারদাদেবীর অনুপ্রেরণায় নিবেদিতা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজেও সেই সময় আত্মনিয়োগ করেন। সেইজন্যেই বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর বাড়িটি ভাড়া নিলেন। তারপরই স্থানীয় নাগরিকদের একটি সভা ডাকলেন তিনি। ওই ঐতিহাসিক সভাটিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলবাম বসুর দোতলার হলঘরে।

'উদ্বোধন' পত্রিকার (৪২ বর্ষ, ৬ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫৯) বিবরণ থেকে জানতে পারি, 'নিবেদিতার সেই প্রথম উদ্যম। বাগবাজার পল্লীতে বালিকা-বিদ্যালয় খুলবেন সংকল্প। একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে সব গৃহস্থ ভক্তদের একটি সভা হলঘরে হল। যাতে গৃহস্থরা মেয়ে দেন ওই স্কুলে—এই উদ্দেশ্য। সকলে বসে আছেন, এমন সময় অতর্কিতভাবে স্বামীজী সবার পিছনে এসে আসন গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলেন। মাস্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, হরমোহনবাবু প্রভৃতি ছিলেন। স্বামীজী কয়েকজনকে হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে শুঁতো দিচ্ছেন আর বলছেন, 'ওঠ, ওঠ! শুধু মেয়ের বাপ হলেই তো হবে না। জাতীয়ভাবে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাতে সহযোগিতা তোদের সবাইকে করতে হবে। উঠে বল, আবেদনের প্রত্যুত্তর দে। বল, হ্যাঁ আমরা রাজি আছি, আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব'। অবশেষে রাজি হলেন কেউ কেউ।

বলরামবাবুর বাড়ি তাই ভারতের সমাজ আন্দোলনের ইতিহাসে এক মহাপীঠস্থান। এখানেই রামকৃষ্ণ প্রচার করলেন তাঁর নতুন যুগের মন্ত্র, এখানেই প্রতিষ্ঠিত হল সেই মন্ত্রকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। আবার এখান থেকেই শুরু হল সেই সঙ্ঘের কর্মকাণ্ড। এখানে এখন পরিচালিত হয় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-বিপ্লবের ইতিহাসে এই বলরাম মন্দির এক পবিত্র পীঠভূমি।

স্বয়ং সত্য শ্রীরামকৃষ্ণ

সেদিন ছিল চৈত্রমাসের শেষ। ভরদুপুর। আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়ছে। এই প্রচণ্ড গরমে শ্রীরামকৃষ্ণ চললেন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতার বাগবাজারে। ডেকে আনা হল একটা ঘোড়ার গাড়ি। সবাই বললেন, এখন কেন, পরে যাবেন। বিকেলে যাবেন।

কিন্তু তিনি কোন কথা শুনবার পাত্র নন। এই দুপুরেই তাঁকে যেতে হবে। কারণ, তিনি কথা দিয়েছেন। এতটা পথ প্রচণ্ড রোদের মধ্যে তিনি এলেন। এই গরমে ঘামতে ঘামতে তিনি বিকেল তিনটের সময় বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে এসে পৌঁছলেন।

বলরাম বসুর বাড়ি, পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত বলরাম মন্দির। সে বাড়িরও সবাই অবাক হয়ে গেলেন। এমন অসময়ে এত কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের জবাব: "বলে ফেলেছি, তিনটার সময় যাব। তাই এসেছি। কিন্তু ভারি ধূপ।"

সেই ভারি ধূপে এসে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাই দেখে বলরামবাবুর বাড়ির সবাই যেমন কষ্ট পেলেন, তেমনি বিচলিত হয়ে পড়লেন অন্যান্য ভক্তরাও। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি আরও একঘণ্টা পরে আসতেন, তাহলেও কেউ কিছু ভাবত না। কিন্তু ভাবতেন তিনি নিজে। কারণ, তাতে তাঁর কথার খেলাপ হত। সত্যভঙ্গ হত। তিনি সত্যের জন্য সবকিছু করতে পারতেন, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ছাড়তে পারতেন না। তাঁর কাছে সত্যই ছিল ধর্ম।

দেবী ভবতারিনীকে শ্রীরামকৃষ্ণ সবকিছু দিতে পেরেছিলেন, পারেননি শুধু সত্য দিতে। সেদিনের দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের

ঘটনাটি আমরা স্মরণ করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। যা চেয়েছেন, তাই পেয়েছেন তিনি। সকল চাওয়া-সমাপন হয়েছে তাঁর জীবনে।

মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। যেমন একটি শিশু তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, অভিমান করছেন। মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, আব্দার জানাচ্ছেন। ফুল হাতে নিয়ে মায়ের চরণে অর্পণ করছেন নিজের সমস্ত সংস্কার। সবকিছু ঢেলে দিচ্ছেন মায়ের চরণে। বলছেন শিশুর মত, "মা এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা। এই নাও তোমার ভালো, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা।" জাগতিক প্রার্থনীয় সবকিছু ঢেলে দিলেন তিনি মায়ের পায়ে, কেবল পারলেন না সত্য ত্যাগ করতে। তাই তিনি বললেন না একবারও, "এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা।"

কেন পারলেন না তিনি সত্য ত্যাগ করতে? সবকিছু দিয়েও একটা জিনিস কেন দিতে পারলেন না তিনি? এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি নিজেই, বলেছেন "সত্যকে ত্যাগ করলে কি নিয়ে থাকব?" আমরা পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও সত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করি। স্বামীজীও বলছেন, "সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করতে পারি না।" আমাদের সংসারে এবং সমাজে আজ যে শূন্যতা, যে অপূর্ণতা এবং যে অবিশ্বাস ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে রয়েছে সত্যকে আকড়ে না থাকার মানসিকতা। বেঁচে থাকার অর্থ তখনই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, তখনই অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়, যখন সেই বেঁচে থাকার প্রধান শর্ত হয় সত্যকে প্রাণপণে সঙ্গে

নিয়ে চলা। শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন আমরা অনুসরণ করি, তখন এই সত্যনিষ্ঠার ভাবটা গ্রহণ করি কতজন ?

শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্রজীবন সত্যনিষ্ঠারই ইতিবৃত্ত। তাঁর নিজের যেমন সত্যনিষ্ঠা ছিল, তিনি সেরকম সত্যনিষ্ঠা অপরের কাছ থেকে প্রত্যাশাও করতেন। সেই প্রত্যাশাপূরণ না হলে দুঃখ পেতেন, কষ্ট পেতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে। এরকম অনেকের কাছেই তিনি নিজের থেকে গেছেন। সেযুগে বিদ্যাসাগরের দারুণ খ্যাতি, চারদিকে তাঁর নাম। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ গেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দেখা হল। দু'জনে অনেক কথা হল। হল অনেক পরিহাস। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ একসময় বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বিদ্যাসাগরও এককথায় রাজি হয়ে গেলেন, কথা দিলেন যাবেন বলে।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবছেন, বিদ্যাসাগর আসবেন। তিনি কথা দিয়েছেন। ওদিকে বিদ্যাসাগর হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন। হাজার কাজে ব্যস্ত থাকেন তিনি—দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা হয়ত স্মরণেই ছিলনা। অথবা, তিনি হয়ত নিছকই ভদ্রতার খাতিরে ওরকম কথা দিয়েছিলেন। এরমধ্যে কোন গুরুত্ব ছিলনা। বিদ্যাসাগর যেভাবেই কথাটা দিয়ে থাকুকনা কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সেটাকে দারুণ গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলেন। তাই বিদ্যাসাগর না আসায় তিনি যে দুঃখ পেয়েছিলেন, সেটা আর গোপন রাখতে পারলেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয়না কেন ? সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন বললে, এখানে আসবে, কিন্তু এলো না।"

শুধু কথা নয়, মানুষের আচরণেও সেই সত্য থাকবে প্রতিষ্ঠিত—এটাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন। তাই তিনি দেখতেও চেয়েছিলেন, সব মানুষ সত্যের প্রতি হবে বিশ্বস্ত। এই

প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের সঙ্গে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন একজন গৈরিক বসনধারী যুবক। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার ভালো করে সেই যুবককে দেখলেন। মানুষের চরিত্র বোঝার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী তিনি। প্রশ্ন করলেন, "আবার গেরুয়া কেন? একটা কিছু পরলেই হল? মিথ্যা কিছুই ভালো নয়। মিথ্যা ভেক ভালো নয়।" তারপরই তিনি যেন সেই যুবকের মাধ্যমে সকল মিথ্যাচারীকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন, "ভেকের মত যদি মনটা না হয়, তাহলে সর্বনাশ হয়। মিথ্যা বলতে বা করতে এসে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভালো। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে। আবার বাইরে গেরুয়া! বড ভয়ঙ্কর!"

আবার দেখেছি, কেউ যদি মাথা তুলে অসত্যের বিরোধিতা করতেন, কিংবা করতেন মিথ্যার প্রতিবাদ, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন আনন্দিত হতেন। এরকমই একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সেদিনও তিনি দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন, বসে আছেন তাঁর সেই ছোট খাটটির উপর। তাঁকে ঘিরে মেঝেতে বসে আছেন অনেকেই। বসে আছেন শশধর তর্কচূড়ামণি, মণি মল্লিক এবং কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত। আলোচনার বিষয়ও ছিল ব্রাহ্ম-আন্দোলন। ব্রাহ্মণ সমাজের দোষগুণ নিয়ে মণি মল্লিকের সঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণির তর্কযুদ্ধ তখন জমে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতের যুক্তির সারবত্তা ও সাহস দেখে খুব খুশি। তিনি হাসছেন আর মাঝে মাঝে বলছেন, "অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ করে থাকতে নেই।" যাঁরা অসত্য বলে এবং মিথ্যাচার করে তিনি তাঁদের সহ্য করতে পারতেন না, বলতেন, "যাঁরা বিষয় কর্ম করে—অফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্য থাকা চাই। সত্য কথা কলির তপস্যা।" তিনি যেন সকল সংসারী মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন:

"সংসারে থাকতে গেলে সত্যকথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে পাওয়া যায়।"

আরেকদিন নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করার জন্য সেদিনও অনেক মানুষের ভিড়। প্রসঙ্গ থেকে যাচ্ছিলেন তিনি প্রসঙ্গান্তরে। একসময় বললেন, "একজন আসে, আমি তার জিনিস খেতে পারি না। সে অফিসে কর্ম করে। তার ২০ টাকা মাহিনা। আর ২০ টাকা কি মিথ্যা লিখিয়া পায়। মিথ্যা কথা কয় বলে, সে এলে আমি বড় কথা কই না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের জীবন, সংসার এবং সমাজকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এত কথা বলেছেন, এতকিছু নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন। শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃতে আমরা যা'কিছু পাই, যা'কিছু পড়ি, তার প্রায় সবটাই সংসারীদের জন্য। কারণ, শ্রীম বা মাস্টার মশাই দক্ষিণেশ্বরে শুধু তখনই উপস্থিত থাকতেন, যখন সেখানে সংসারীদের শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিতেন। ত্যাগী সন্তান, কিংবা ভাবীকালের সন্ন্যাসীদের যখন তিনি উপদেশ দিতেন, তখন সেখানে কোন গৃহী থাকতে পারতেন না। থাকতেন না মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাস্টার মশাইও। শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী মানুষকেই বারবার সত্যের দিকে টেনে আনতে চেয়েছেন, অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করেছেন। মানুষ সত্যকে ছেড়ে অসত্যের কাছে নতি স্বীকার করতে করতে এখন যখন ভীরু কাপুরুষে পরিণত হতে চলেছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এক নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। সত্যকে ধরে থাকতে না পারলে ধর্মকেও ধরা যায় না, ঈশ্বরের সাধনাও হয় নিস্ফল। এই পরম সত্যই তিনি বারবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলেই সকল ধর্মের সত্যকে অনুভব করেছিলেন স্বীয় জীবনে এবং মননে। তিনি মনে করতেন, প্রত্যেকটা ধর্মই স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সত্য। তিনি কখনও

বলেননি, আমারটা সত্য, তোমারটা ভ্রান্ত। কিংবা বলেননি কোনদিন, আমি যেটা বলি, সেটাই সত্য। বরং বারবার তিনি বলেছেন, আমি যা বলি, সেটাকে বিনা বিচারে মেনে নেবেনা। নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে বিচার করে যদি আমার কথাকে সত্য বলে মনে হয়, তবেই মেনে নেবে। প্রখর জ্ঞানমার্গী স্বামী বিবেকানন্দ কত তর্ক করতেন তাঁর সঙ্গে। তাতে তিনি খুশিই হতেন। কারণ, তিনি চাইতেন, তর্ক করে সত্যকে বুঝে নাও।

অনেকের কাছে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই সাধারণ ঘটনাগুলির মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ স্বরূপ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে কথা বলি, কত প্রতিজ্ঞা করি, আবার কত কথার খেলাপ করি, কত প্রতিজ্ঞা কার্যকালে বেমালুম ভুলে যাই। এরকম ছোটোখাটো ঘটনাই আমাদের শেষ পর্যন্ত বড় সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের মত মানুষ কত সাধারণ কারণেও সত্য রক্ষা করেছেন—তা এক বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত।

একবার তিনি বলছেন, "রামের বাড়ি গেলুম কলকাতায়। বলে ফেলেছি লুচি খাবনা। যখন খেতে দিলে, তখন আবার ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাবনা বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই।" তিনি আরেকদিন বলছেন, "যদি হঠাৎ বলে ফেলি খাবনা, তবে ক্ষিদে পেলেও খাবার জো নেই।" একবার শ্রীরামকৃষ্ণের পেটের অসুখ হয়েছে। কবিরাজ এসে দেখলেন তাঁকে, বললেন তিনটা লেবু খেতে। তাঁর এক শিষ্য বুড়ো গোপাল গেলেন লেবু আনতে। নিয়ে এলেন অনেকগুলি লেবু। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র তিনটি লেবু রেখে বাকিগুলি ফেরৎ দিলেন।

এরকম কত ঘটনা আছে। তার দৈনন্দিন জীবনে সত্যরক্ষার এমন কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পাই। তখন তাঁর গলায় অসুখ বেড়ে গেছে। খুব কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। তাঁকে এনে রাখা হয়েছে কাশীপুরের এক বাড়িতে! একদিন দুপুরে তিনি পালো দেওয়া ক্ষীর

খেতে চাইলেন। তাঁর খুব ইচ্ছে হয়েছে। একথা শুনেই তাঁর আরেক ত্যাগী সন্তান যোগীন ক্ষীর আনার জন্য পরদিন সকালে কলকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, ঠাকুরের ইচ্ছার কথা। সেকথা শুনে বলরাম বসুর বাড়ির সবাই বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষীর খেতে চেয়েছেন—সে ক্ষীর বাজার থেকে কেন কেনা হবে? আমরা তৈরি করে দিচ্ছি।" তাঁরা নিষ্ঠাভরে ভালো করে ক্ষীর তৈরি করে যোগীনের হাতে দিলেন। যোগীন সেই ক্ষীর নিয়ে ফিরে এলেন, দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি কিন্তু সে ক্ষীর স্পর্শও করলেন না। কেন স্পর্শ করলেন না? তিনি দুপুরে পালো দেওয়া ক্ষীর বাজার থেকে কিনে এনে খেতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষীর পরদিন এসেছে এবং বাজার থেকে কেনা নয়, ভক্তদের তৈরি। এ ক্ষীর খেলে কথা রাখা হবে না।

এই কথা রাখা এবং কথার দাম দেওয়া তাঁর সারাজীবনের এক মস্ত সম্পদ। যিনি কথা দিয়ে কথা রাখতেন না, কিংবা কথার দাম দিতেন না, তিনি কিছুতেই তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা এবং সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা আমরা জানি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে ভালোবাসতেন। শুধু তাই নয়, শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মবোধ এবং ঈশ্বরানুরাগের প্রশংসাও করতেন তিনি। এই শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে একদিন ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। কথায় কথায় একসময় তিনি বললেন, "শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে। কথার ঠিক নাই। আমাকে একবার বলেছিল যে, একবার ওখানে যাবে, তা' যায় নাই। আর কোনও খবর পাঠায় নাই। ওটা ভালো নয়।" এই প্রসঙ্গেই তিনি তাঁর গৃহী ভক্তদের উদ্দেশে বলছেন, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সকলকে, "সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে সব নষ্ট হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না, বরং তাঁকে প্রায় নিরক্ষর বলাই সঙ্গত। তিনি শাস্ত্র পড়েননি, অথচ যেসব কথা বলেছেন এবং নিজের জীবন দিয়ে সেসব সত্য প্রমাণ করেছেন, তা আমাদের শাশ্বত ও সনাতন শাস্ত্রেরই কথা। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি যা বলেছেন তাও কি নতুন কথা নয়, কিন্তু বলেছেন নতুন ভাবে সহজ সরল ভাষায়, যা সকলের বোধগম্য হয়। একটা অবিশ্বাসী এবং সংশয়াচ্ছন্ন যুগে তিনি এসেছিলেন, এসেছিলেন মানুষের মোহ ভঙ্গ করতে। সে যুগের মানুষ সত্যকে ত্যাগ করে মিথ্যার লোভের বশে অসত্যের দিকে ছুটে চলেছিলেন, স্বদেশ এবং স্বদেশের ঐতিহ্যকে ভুলে, বিদেশ এবং বিদেশের মোহে ছুটে চলেছিলেন দিগ্‌ভ্রান্তের মত। সেই অস্থির যুগে নির্জন গঙ্গাতীরের সেই মন্দিরে বসে প্রায় নিরক্ষর গদাধর যে সব কথা বললেন, তা সে যুগের সকল উচ্চশিক্ষিত মানুষকেও মন্ত্রমুগ্ধ করে। শ্রদ্ধায় তাঁরা মাথা নত করেন ওই ব্রাহ্মণের কাছে।

আমাদের উপনিষদ ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ বলেছে, বলেছে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। বলা হয়েছে, সত্য ব্রহ্ম থেকে সমুদ্ভূত, সত্যই ব্রহ্মের আশ্রয়, সত্যের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মই সত্যের সত্য, সত্যকে কখনও ত্যাগ করবে না। মহাভারতেও আমরা দেখি, মহাবীর ভীষ্ম রাজধর্ম পালন সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে দয়া, মমতা, ক্ষমা ইত্যাদি তেরোটি গুণকে সত্যের সাথে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। আমাদের বরাহ পুরাণ বলছে, "সমস্ত জগতের মূলে সত্য বর্তমান।" মনু বলছেন, "সত্য কথা বলবে। প্রিয় বাক্য বলবে। অপ্রিয় সত্য বলবে না। তাই বলে প্রিয় মিথ্যা কথাও বলবে না।"

এই যে হাজার হাজার বছরের সত্য-সাধনা এবং সত্যপরায়ণতা, এসব কিছুই যেন জীবন্ত মূর্তিতে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। এযুগে যখন সত্য বারবার সঙ্কুচিত, তখন নব যুগের প্রবর্তক আমাদের মোহান্ধ চোখের সামনে সত্যের আলোকে নিজের জীবনে সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই জন্যই তিনিই স্বয়ং সত্যস্বরূপ।

যীশুখ্রীষ্ট শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

বেথলেহেম থেকে কামারপুকুর ভৌগলিক দূরত্বের পরিমাপে অনেক অনেক দূর ঠিকই, কিন্তু ঐতিহাসিক তাৎপর্যে এই দু'টি পবিত্র স্থানের মধ্যে দূরত্বের পার্থক্য আদৌ কিছু নেই। মানুষের দুঃখ-কষ্টে কাতর হয়ে ঈশ্বর স্বয়ং এসে যখন মানব রূপ ধারণ করেন, পথ দেখান মানব মুক্তির, তখন তিনিই ইতিহাসের আলোকে অবতার পুরুষ বলে চিহ্নিত হন। অবতরণ করেন বলেই তিনি অবতার। যীশু অবতরণ করেছিলেন বেথলেহেমে। আর কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ এই দু'জনের সাদৃশ্য অবাক হয়ে লক্ষ্য করার বিষয়।

এক অত্যন্ত দরিদ্র পরিবেশে আস্তাবলে জন্ম হয়েছিল যীশুখ্রীষ্টের আর কামারপুকুরে এক ঢেঁকিশালে জন্ম হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। এই ঘটনাকে কি নিছকই কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়? রাজার প্রাসাদে যদি এঁদের জন্ম হত, তাহলে কি আদৌ মানাত? অথবা, রাজপ্রাসাদে জন্ম হলেও ভগবান বুদ্ধদেবের মতই সবকিছু ত্যাগ করে নেমে আসতে হত পথের ধুলায়, কিংবা নবদ্বীপের বিখ্যাত নিমাই পণ্ডিতের মত জ্ঞানের গরিমা ত্যাগ করে সর্বত্যাগীর বেশে গ্রহণ ও বরণ করতে হত প্রেমের মহিমা।

যীশুখ্রীষ্টের জননীকেও স্বগ্রাম থেকে হতে হয়েছিল বাস্তুচ্যুত। একই ঘটনা ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের সত্যাশ্রয়ী জীবনেও—শুধু সত্যরক্ষার জন্যই জমিদারের রোষানলে পড়ে দেড়ে গ্রাম ত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। আবার যীশুর জন্মলগ্নে যেমন অদ্ভুত সব দৈব ঘটনা ও ইঙ্গিত প্রমূর্ত হয়ে

উঠেছিল, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-লগ্নের ইঙ্গিত বহন করে নানারকম দিব্যদর্শন ঘটেছিল তাঁর পিতা-মাতার জীবনে। একজন মানুষের দুঃখকে বরণ করে স্বেচ্ছায় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, আরেকজন জগতের পীড়া নিজের দেহে গ্রহণ করে জীবনপাত করেছিলেন—যা ছিল তাঁরও স্বেচ্ছামৃত্যু। আর দু'জনেই গ্রামীন জীবনের সারল্য ও মাধুর্য নিয়ে নগর জীবনকে করেছিলেন আপ্লুত। দু'জনেই ছিলেন জীবন্ত প্রেমের প্রতীক।

স্বামী সারদানন্দ লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" অনুসরণে (সাধক ভাব, পৃঃ ৩৭০) আমরা যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-মিলনের এক অপরূপ ঘটনার কথা জানতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শম্ভুচরণ মল্লিক নামে এক ভদ্রলোকের। এই শম্ভুচরণের কাছেই শ্রীরামকৃষ্ণ বাইবেলের কথা ও কাহিনী প্রথম শোনেন। শোনেন যীশুর পবিত্র জীবনের কথা। সেই সঙ্গে জানতে পারেন, যীশু কিভাবে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। যীশু সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের আগ্রহ ক্রমশ বাড়তে থাকে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অত্যাশ্চার্য পথ দেখাতে এবং তৈরি করতেই যিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁর কাছেতো খৃষ্টধর্ম এবং খৃষ্ট-সঙ্গে মিলনের বাসনা অনিবার্য ভাবেই প্রত্যাশিত।

সে সুযোগও একদিন এসে গেল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ছিল যদুলাল মল্লিকের বাগান বাড়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে যেতেন। যদুলাল মল্লিক এবং তাঁর মা শ্রীরামকৃষ্ণকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। অনেক সময় তাঁরা না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ বাগান বাড়িতে যেতেন এবং বাগানের কর্মচারীরা সসম্মানে তাঁকে বাগানের এবং ঘরের দরজা খুলে দিতেন।

ঘরের দেওয়ালে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ঝোলানো ছিল। তার মধ্যে একটি ছবি ছিল মা মেরীর কোলে শিশু যীশু। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ওই ঘরে তন্ময় হয়ে ছবি দেখছিলেন আর যীশুর অপূর্ব

দিব্যজীবন কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ যেন তিনি দেখলেন "মা মেরীর কোলে শিশু যীশু" ছবিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে জ্যোতির্ময়। এই অদ্ভুত দেবজননী এবং দেবশিশুর দেহ থেকে জ্যোতিরশ্মি বেরিয়ে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য দেহে প্রবেশ করে তাঁর মানসিক ভাব-গুলির আমূল পরিবর্তন করিয়ে দিচ্ছে। জন্মগত হিন্দু সংস্কারগুলি অন্তরের নিভৃত কোনে লীন হয়ে অন্য সংস্কারগুলি অন্তরে উদয় হচ্ছে—এই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ নানা ভাবে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর হয়ে বলতে শুরু করলেন : "মা আমাকে একি করছিস্ ?"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ওই সংস্কার তরঙ্গ প্রবল বেগে উঠে এসে তাঁর মনের হিন্দু সংস্কারগুলিকে এককালে তলিয়ে দিল। তখন দেবদেবী সকলের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ, ভালোবাসা কোথায় বিলীন হল এবং যীশুর ও তাঁর প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এসে হৃদয় অধিকার করে। খ্রীস্টিয় পাদরিরা যীশু মন্দিরে শ্রীশ্রীযীশুর মূর্তির সামনে ধূপ-দীপ দান করছে, অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় নিবেদন করছে—এই সকল বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরে এলেন, কিন্তু যীশু সংক্রান্ত বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রইলেন। এমনকি এক সময় মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে মাকে দর্শন করার কথাও ভুলে গেলেন। তিনদিন পর্যন্ত ওই ভাবতরঙ্গ তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল।

তিনদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতলে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, "এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, সুন্দর গৌরবর্ণ," স্থির দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে দেখতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শনেই বুঝলেন, ইনি "বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূত"। তিনি দেখলেন, "বিশ্রান্তি নয়ন যুগল" এই অপরিচিত বিদেশীর মুখের অপুর্ব শোভা সৃষ্টি করেছে এবং নাক একটু চাপা হলেও তাতে ওই সৌন্দর্যের

কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি। ওই "সৌম্য মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব" দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবতে লাগলেন— "কে ইনি?"

ধীরে ধীরে ওই অপূর্ব দিব্য মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এলেন এবং ঠাকুরের পূত-হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ধ্বনিত হতে লাগল, "ঈশামসি—দুঃখ যাতনা থেকে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোনিতদান এবং মানব হস্তে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, সেই ঈশ্বরভিন্ন পরমযোগী প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি!"

সেই দেবমানব ধীরে ধীরে আরও এগিয়ে এলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁর শরীরে লীন হলেন। এই আকস্মিক ঘটনায় ভাবাবিষ্ট হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মন সগুণ বিরাট ব্রহ্মের সঙ্গে বহুক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হয়ে রইল। এই ভাবে যীশুখ্রীষ্টের দর্শন লাভ করে ঠাকুর তাঁর অবতারত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছিলেন।

এই ঈশ্বরীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্বামী সারদানন্দ বলছেন, একদিন যীশুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের প্রশ্ন করেছিলেনঃ "হ্যা, রে, তোরাতো বাইবেল পড়েছিস, বল দেখি তাতে ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা আছে? তাঁকে দেখতে কি রকম ছিল?"

উত্তরে তাঁরা বললেন, ওই কথা বাইবেলের কোথাও উল্লিখিত দেখিনি। তবে যীশু ইহুদি জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাঁর চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়।

একথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি তাঁর নাক একটু চাপা। কেন ওরকম দেখেছিলাম, কে জানে। একথা শুনে সেখানে উপস্থিত সকলে ভেবেছিলেন, ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্তির সংগে যীশুর আসল মূর্তির মিল হবে কিভাবে?

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দ ও অন্যান্য

সন্তানরা জানতে পারলেন, যীশুর শারীরিক গঠন সম্বন্ধে তিন রকম বিবরণ পাওয়া যায়—যার একটিতে বলা হয়েছে, তাঁর নাক চাপা ছিল।

সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের মহামন্ত্র বিশ্ববাসীকে শোনাতেই যিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই দেখি পূর্ববর্তী অবতারের সঙ্গে তাঁর মহামিলনের বিস্ময়কর ঘটনা। কেউ তাঁর কাছে দূরের নয়, কেউ তাঁর কাছে পর নয়। "পাপী" বলে কাউকে তিনি বর্জন করেন নি, নরক বলে কাউকে ভয়ও দেখান নি। প্রেম—শুধু অপার অনন্ত প্রেম দিয়েই তিনি মানুষকে জয় করেছেন, মানুষের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের উপক্রমণিকায় দেখি, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীর কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে বলছেন: "মা, তোর খৃস্টান ভক্তেরা তোকে কিরূপে ডাকে দেখবো, আমায় নিয়ে চ।" কিছুদিন পরে তিনি কলকাতায় গিয়ে এক গির্জার দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে উপাসনা দেখছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ভক্তদের বললেন, "আমি খাজাঞ্চির ভয়ে ভিতরে গিয়ে বসিনি—কি জানি যদি কালী ঘরে যেতে না দেয়।" অর্থাৎ গির্জায় ঢোকার কারণ দেখিয়ে যদি ঠাকুরকে মন্দিরে ঢুকতে না দেয়। এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, সেটা পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণিত। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দকেও মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি—কারণ তিনি সাগর পার হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন।

শুধু বচনে বা ভাষণে নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের অপরূপ পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন বলেই তাঁর "যতমত ততপথ" তত্ত্ব আজ বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য বলে প্রমাণিত।

* * *

এবার আমরা ফিরে তাকাতে পারি নবদ্বীপের দিকে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ১৪৮৫ সালে। আর সাড়ে তিনশ'

বছরের ব্যবধানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয় ১৮৩৬ সালে। দুজনেরই জন্ম মাস ফাল্গুন মাস। আবির্ভাবকাল বসন্তকাল। দেশ ও সমাজের এক ভয়ঙ্কর সংকটের দিনে নবদ্বীপের পবিত্র মাটিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তেমনি সাড়ে তিন শ' বছরের ব্যবধানে পরিবেশ ও পটভূমিকার বদল হলেও একই ধরনের সংকট ও সংশয়ের আবর্তে মৃতপ্রায় ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

ব্যবধান সাড়ে তিন শ' বছরের হলেও অনেক ব্যাপারে দুজনের তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগ লক্ষ্য করার মত। সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নিমাই মানব-মুক্তির পথ তৈরি করার জন্য পাণ্ডিত্যকে বিসর্জন দিয়ে ভক্তিকে অবলম্বন ক:লেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত ছিলেন না, তেমন শিক্ষিতই ছিলেন না, অথচ এমন সব কথা বললেন, যেগুলি মূলত শাস্ত্রের বচন। নিমাই যেমন কৃষ্ণপ্রেমে আত্মসমর্পিত তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও বারবার কৃষ্ণপ্রেমেই মেতে উঠছেন। কৃষ্ণনামে দুজনেরই সমাধি হত।

এইসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা অনেকেরই মনে হতে পারে এবং সেটা হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে শ্রীচৈতন্যকে দেখেছেন। এ ব্যাপারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে, এ যুগের অবতারবরিষ্ঠ পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে সে যুগেব অবতারশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করেছেন। কথামৃত তৃতীয় ভাগের নবম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞান সূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম দুইই ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞান এবং ভক্তিপ্রেমের উল্লেখ যেমন বারবার করেছেন, যেমন বর্ণনা করেছেন তার মাহাত্ম্য এবং দেখিয়েছেন তার স্বরূপ, তেমনি এই প্রসঙ্গে তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন শ্রীচৈতন্যের কথা। কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে (১১ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) তিনি শ্রীচৈতন্যমাহাত্ম্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজস্ব অনুপম ভঙ্গীতে

বলেছেন : 'চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা হত। (১) বাহ্যদশা—তখন স্থূল আর সূক্ষ্মে তাঁর মন থাকত। (২) অর্ধ বাহ্যদশা—তখন কারণ শরীরে, কারণানন্দে মন গিয়েছে। (৩) অন্তর্দশা—তখন মহাকারণে মন লয় হত।

লীলাপ্রসঙ্গে (স্বামী সারদানন্দ রচিত) দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে, নবদ্বীপ দর্শন করে ফেরার সময় তিনি চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দের দর্শন পেয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁর দেহে মিশে গিয়েছিলেন। এই দর্শনের পর তিনি নিঃসন্দেহ হন যে, চৈতন্যদেব "বাস্তবিকই অবতার"। আবার কথামৃতে দেখেছি (২।২২।৩) শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "তিনি ঈশ্বরের অবতার। তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ।"

এরপরই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার; জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। কথামৃতের প্রথম ভাগে (৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) তিনি বলেছেন : কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। ভক্তিপথ সহজপথ। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণগান কর, প্রার্থনা কর, ভগবানকে লাভ করবে, কোন সন্দেহ নেই।

শুধু রামকৃষ্ণদেব নন, তাঁর ভাববাহী স্বামী বিবেকানন্দও বারবার শ্রীচৈতন্যের যুগান্তকারী আবির্ভাবের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলন জয় করার পর তাঁকে মাদ্রাজবাসীদের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দন বার্তা পাঠানো হয়েছিল, তারই উত্তরে তিনি লিখেছেন : একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছেদক জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। একবার মাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, কিছুদিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।......শ্রীচৈতন্য নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে অপার শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা বিভিন্ন ঘটনা থেকেই জানা যায়। "ভারতে বিবেকানন্দ"

গ্রন্থে দেখি স্বামী বিবেকানন্দ এক ভাষণে বলেছেন: জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হইয়াছেন, এই প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য তাঁহাদের অন্যতম।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে লিখছেন: শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর (কেশব ভারতী) নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সুতরাং ভারতী ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাঁহার ধর্ম-প্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন। বোধহয় পুরী সম্প্রদায় (দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যতম) বঙ্গদেশে আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে চৈতন্যদেবকে স্মরণ করেছেন, এক বক্তৃতার উপসংহারে বলেছেন, (ভারতে বিবেকানন্দ), আমি এখন এই আর্যাবর্ত নিবাসী ভগবান শ্রীচৈতন্যের বিষয় উল্লেখ করে বক্তৃতা শেষ করব। চৈতন্যদেব স্বয়ং একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখনকার এক খুব বড় পণ্ডিতবংশে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ন্যায়ের অধ্যাপক হয়ে বাগযুদ্ধে লোককে পরাস্ত করতেন। এটাই তিনি বাল্যকাল থেকে জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলে শিক্ষা করেছিলেন। কোন মহাজনের কৃপায় এই ব্যক্তির সারাজীবন পরিবর্তিত হয়ে গেল। তখন তিনি বাদ-বিবাদ, তর্ক, ন্যায়ের অধ্যাপকতা—সবই পরিত্যাগ করলেন। জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য হয়েছেন, এই প্রেমোন্মত্ত শ্রীচৈতন্য তাঁদের অন্যতম। তাঁর ভক্তির তরঙ্গ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হয়ে সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাঁর প্রেমের সীমা ছিল না।

শ্রীচৈতন্য তাবৎ মানুষের সামনে জীবের মুক্তির জন্য ভক্তিস্রোতের যে অনন্ত পবিত্র প্রবাহ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং আচার অনুষ্ঠানের বদলে নামগানে মুক্তির যে পথ দেখিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই প্রবাহ ও পথকে নতুন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

মাতৃপূজায় মাতৃসাধক

কলকাতায় জানবাজারে জমিদার মথুরানাথের বাড়ি। সেবার দুর্গাপূজার সময় তার বাড়িতে যেন আনন্দ আসর বসেছে। একদিকে দুর্গাপূজার আনন্দ। অন্যদিকে আরেকটি বড় আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার সময় সে বাড়িতে স্বয়ং উপস্থিত আছেন। "ঠাকুরের ভাবাবেশে এবং অপূর্ব আচরণে 'প্রতিমা' বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন।..."

"আর বাটীর সর্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে।...ধনী মথুরের রাসত্রিক ভক্তি, ঘর-দ্বার ও মার প্রতিমা বিচিত্র সাজে সাজাইতে পত্রপুষ্প ফলমূল মিষ্টান্নাদি পূজার দ্রব্য সম্ভারের অপর্যাপ্ত আয়োজনে এবং নহবতাদি বাদ্য ভাণ্ডের বাহুল্যে মনোনিবেশ করিয়া বাহিরের কিছুরই যেমন ত্রুটি রাখে নাই, তেমনি আবার ঐ অদ্ভুত ঠাকুরের অলৌকিক দেবভাব বাহিরের ঐ জড় জিনিস সকলকে স্পর্শ করিয়া উহাদের ভিতর সত্য সত্যই একটা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে।"

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ সেদিনের সেই দুর্গাপূজার বিবরণ এভাবেই দিয়েছেন:

দিনের পূজা শেষ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এবার মা দুর্গার আরতি হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁর পুরুষ শরীরের কথা পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছেন, তাঁর কথা ও প্রকাশে এমন একটা ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে যে, তিনি যেন জন্ম-জন্মান্তরে জগন্মাতার দাসী বা সখী। জগদম্বাই তাঁর প্রাণমন, মার সেবার জন্যই তাঁর দেহ এবং জীবনধারণ। ঠাকুরের

মুখমণ্ডল ভাবে প্রেমে সমুজ্জ্বল, অধরে মৃদু মৃদু হাসি, চক্ষের চাহনি, হাত-পা নাড়া অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়। ঠাকুরের পরিধানে মথুরবাবু প্রদত্ত সুন্দর গরদের চেলি—স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় করিয়া পরিয়াছেন—কে বলিবে যে, তিনি পুরুষ। এই বর্ণনা আমরা পাই স্বামী সারদানন্দের বয়ানে (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গুরুভাব, পৃঃ ১৮৯-১৯৮)।

দুর্গার আরতি শুরু হয়েছে। মথুরবাবুর পত্নী জগদম্বা দাসী শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবাবেশ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন পূজামণ্ডপে। সেখানে তিনি অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে চামর দিয়ে প্রতিমাকে বীজন করতে থাকেন ঠাকুর দালানের একদিকে। স্ত্রীলোকেরা এবং অন্যদিকে মথুরবাবু ও পুরুষেরা আরতি দেখছিলেন। হঠাৎ মথুরবাবুর চোখে পড়ল তাঁর স্ত্রীর পাশে বিচিত্র বস্ত্রভূষণে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে দেবীকে চামর করছেন। বারবার দেখেও তিনি বুঝতে পারছেন না, কে এই মহিলা।

আরতির পর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধারণ ভাব ফিরে এল। তিনি শাড়ি ইত্যাদি বদল করে আবার নিজের কাপড় পরে পুরুষদের মধ্যে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে মথুরবাবু গেছেন অন্দর মহলে। তাঁর মনে তখনও সেই এক প্রশ্ন। তিনি স্বীয় পত্নীকে প্রশ্ন করলেন, 'আরতির সময় তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে চামর করিতেছিলেন?'

এ প্রশ্ন শুনে মথুরবাবুর স্ত্রী হেসে ফেললেন, বললেন, "তুমি চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপে চামর করিতেছিলেন। ··· মেয়েদের মতো কাপড়-চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না।' এই বর্ণনাও লীলাপ্রসঙ্গকারের।

এভাবে মহানন্দে জানবাজারের রাজবাড়িতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা কেটে গেল। এল বিজয়া দশমী। সেদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দর্পণ বিসর্জন করতে হবে বলে পুরোহিত খুব তাড়াতাড়ি দশমী পূজা শেষ করছিলেন। সন্ধ্যার পর হবে প্রতিমা

বিসর্জন। সর্বত্র কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া, আনন্দের শেষে কেমন যেন একটা নিরানন্দের পরিবেশ। বিকেলে মথুরবাবুর কাছে খবর গেল, 'এইবার মার বিসর্জন হইবে বাবুকে নীচে আসিয়া মাকে প্রণাম বন্দনাদি করিয়া যাইতে বল।' মথুরবাবু পূজার আনন্দে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এমনই আত্মহারা হয়েছিলেন যে, তিনি বেমালুম বিসর্জনের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

এদিকে বিসর্জনের সময় পার হয়ে যায়। পুরোহিতমশাই একের পর এক লোক পাঠিয়ে মথুরবাবুকে খবর দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত মথুরবাবু মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন, পুরোহিতকে বলে পাঠালেন, আমি মাকে বিসর্জন দিতে দেব না। 'যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষয় বিভ্রাট হইবে।'

এই খবর গিয়ে পৌঁছাল ঠাকুরদালানে। পুরোহিতমশাই সবকিছু শুনে অবাক হয়ে গেলেন। সকলে মিলে মথুরবাবুকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু কোন কিছুতেই কোন কাজ হল না। মথুরবাবুর সেই এক কথা, "আমি মার নিত্য পূজা করিব। মার কৃপায় আমার যখন সে ক্ষমতা আছে, তখন কেন বিসর্জন দিব ?"

মথুরবাবুর স্ত্রী সবকিছু শুনে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই মথুরবাবুকে শান্ত করতে পারেন এবং এই সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন। জগদম্বা দাসীর কথায় রামকৃষ্ণদেব গেলেন মথুরবাবুর কাছে। তিনি গিয়ে দেখেন, "মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।' তাঁহাকে দেখিয়াই মথুর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, বাবা, যে যাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকিতে বিসর্জন দিতে পারিব না, মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরের বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ও এই

তোমার ভয়। মাকে ছেড়ে থাকতে হবে—একথা কে বলল? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? তিন দিন ঠাকুরদালানে বসে মা তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমারই হৃদয়ে বসে তোমার পূজো নেবেন।”

শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় মথুরের মানসিকতার পরিবর্তন হল। তিনি রাজি হলেন প্রতিমা বিসর্জন দিতে।

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী গদাধর চট্টোপাধ্যায় ধর্ম সাধনার ইতিহাসে এক অনন্য-সাধারণ পথের পথিক—যিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহাব্রত স্বীয় জীবনে পালন করেছেন এবং সেই মহাব্রত পালনের পথ নির্দেশও দিয়েছেন নিজের জীবনবেদকে সামনে রেখে। আমরা তাঁরই সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী সারদানন্দের লেখা “শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে” সেই সাধনেতিহাসের প্রামাণ্য চিত্র পাই। ওই লীলা-প্রসঙ্গ অনুসরণ করেই এখানে তিনটি দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছি, যেগুলির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথা জড়িত। প্রথমটির কথা বলেছি। এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয়। দক্ষিণেশ্বরে তিনি তাঁর মামার সেবা করতেন। আবার মনে মনে মামার পথ ধরে সাধনা করার বাসনাও পোষণ করতেন। ১২৭৫ সালের (ইংরেজী ১৮৬৮) আশ্বিন মাসে হৃদয় ঠিক করলেন, দেশে ফিরে গিয়ে দুর্গাপূজা করবেন। তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা মামাকে বললেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ভাগনের দুর্গাপূজা করার সংকল্পে সানন্দে সায় দিলেন। শুধু সায়ই দিলেন না, কথাটা রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বিশ্বাসকেও বললেন। সে বছর মথুরবাবুর বাড়িতেও দুর্গাপূজা হবে। তাই মথুরবাবুর একান্ত ইচ্ছা, শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার সময় তাঁর বাড়িতেই যেন থাকেন। তবে তিনি হৃদয়ের দুর্গা আরাধনার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সাহায্য দিতেও কার্পণ্য করলেন না।

শেষ পর্যন্ত হৃদয় যখন বুঝলেন যে, তাঁর দেশের বাড়িতে পূজার

সময় শ্রীরামকৃষ্ণ যাবেন না, তখন রীতিমত হতাশ হয়ে পড়লেন, পূজার মধ্যে উৎসাহও যেন ক্ষুণ্ণ হল। তাঁর এই জড়তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তুই দুঃখ করছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখতে যাব। আমাকে অন্য কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু তুই দেখতে পাবি?'

হৃদয়ের দেশ ঠাকুরের গ্রাম কামারপুকুর থেকে বেশি দূরে নয়। তাই ঠাকুরকে সে গ্রামের অনেককেই জানেন। তাই তিনি হৃদয়কে পূজার যাবতীয় ব্যবস্থা কীভাবে কীভাবে করতে হবে, সেসবও বলে দিলেন।

হৃদয় দেশের বাড়িতে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। বাড়িতে এসে তিনি মামার কথামত পূজার যাবতীয় আয়োজন করতে উদ্যোগী হলেন। তারপর যথাসময়ে ষষ্ঠীর দিনে দেবীর বোধন, অধিবাস ইত্যাদি সকল অনুষ্ঠানই সম্পন্ন করে তিনি নিজেই পূজায় ব্রতী হলেন। সেদিন সপ্তমীর পূজা শেষ করেছেন। রাত্রে নীরাজন করছেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, দেবী প্রতিমার ঠিক পাশেই শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্ময় শরীরে ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হৃদয় বলতেন, ওই রূপে প্রতিদিন ওই সময়ে এবং সন্ধি পূজাকাল দেবী প্রতিমা পার্শ্বে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জাগতিক মহাজীবনের শেষ প্রান্তে আরেকটি দুর্গা পূজার কাহিনী পাই, যেটি লীলাপ্রসঙ্গ অনুসরণ করেই এখানে উল্লেখ করছি।

১৮৮৫ সালের শেষ ভাগ। আশ্বিন মাস। শারদীয় পূজা মহোৎসবে কলকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধ বণিতা প্রতি বছর যেমন মেতে ওঠে, সেরকম সে বছরও মেতেছে। সেই আনন্দের প্রবাহ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের প্রাণে বিশেষ রূপে অনুভূত হলেও বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। কারণ যাঁকে নিয়ে তাঁদের আনন্দ—সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শরীরই খুব অসুস্থ। তিনি গলরোগে আক্রান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার জন্য সে সময় উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলের একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে এনে রাখা হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

ডাঃ সরকার প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে দেখতে আসেন। কোনদিন আসেন সকালে। কোনদিন আসেন বিকেলে।

সেদিনের সেই ঘটনার চিত্রময়বর্ণনা পাই "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে।" লীলাপ্রসঙ্গকারকে এবার অনুসরণ করা যাক। তিনি লিখছেন, 'ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—যাহাকে তিনি কখন কখন সুরেশ মিত্র বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্বে তাহাদিগের বাটিতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু একবার বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় অনেকদিন পূজা বন্ধ ছিল। তিনি ঠাকুরকে (সব কথা) জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটিতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতাবশত ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। (তবুও) সুরেন্দ্রনাথ ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।'

'সপ্তমী পূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেক ভক্ত একত্রিত হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তারবাবু (মহেন্দ্রলাল সরকার) অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিলেন। সেই দিব্য লহরী শুনিতে শুনিতে সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।'

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দের ওই বর্ণনায় সাধকভাব, পৃঃ ১৬৪৮ পরবর্তী পর্যায়ে দেখি, এই আনন্দময় পরিবেশে সকলেই আত্মহারা। দেখতে দেখতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ডাঃ সরকার এবার ফিরে যাবেন। তিনি নিজের পুত্রের মত পরম আদরে

স্বামীজীকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ তিনি সমাধি-মগ্ন হয়ে গেলেন। উপস্থিত ছিলেন যাঁরা তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন এখন সন্ধি পূজার সময় তাই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তখন তিনি বললেন তাঁর সমাধিকালের এক অনুভূতির কথা। বললেন, 'এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে। তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতি রশ্মি নির্গত হইতেছে। দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপ-মালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে মা মা বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাঁহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাঁহার প্রাণ শীতল হইবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য সকলে সুরেন্দ্রনাথের সিমলার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, ঠাকুর সমাধির সময় যা যা দেখেছিলেন তা তা সঠিকভাবে মিলে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্য দর্শনে যেখানে প্রদীপের মালা দেখেছেন, সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে ঠিক সেখানেই প্রদীপ জ্বলছে। আর ঠাকুরের যখন সমাধি হয়, ঠিক সেই সময়েই সুরেন্দ্রনাথ দুর্গা প্রতিমার সামনে উঠোনে বসে প্রাণের আবেগে 'মা মা' বলে প্রায় এক ঘণ্টা বালকের মতই কেঁদেছেন।

এই বিস্ময়কর যোগাযোগ সেদিন সকলকে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যাগ্রহ
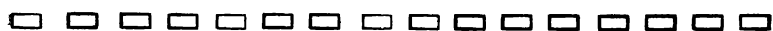
ঐতিহ্যের সুবর্ণপুরী নদীয়া জেলাতেই আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমাজের দলিত ও পতিত শ্রেণীর অসহায় মানুষ সেদিন নামগানের মাধ্যমে এক মহামুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। ভারতের সমাজবিপ্লব তথা ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তাই এক বিস্ময়কর অধ্যায়। আগামী ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সারা পৃথিবী সেই অবতার পুরুষের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের পাঁচশত বছর পূর্তি উৎসব পালন করবে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে।

মানুষের মুক্তির জন্য শ্রীচৈতন্য যে অম্লান প্রেমপ্রবাহের ধারা নদীয়ার বুকে প্রথম সঞ্চারিত করেছিলেন—সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবধানে সেই নদীয়াতেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র ভগবানের নামে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র এবং সেবাধর্ম মহাব্রতের সূচনা করেছিলেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ততটা গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়নি—প্রামাণ্য গ্রন্থে অতি সঙ্কোচে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি দু-তিনটি ছত্রের আড়ালে নিতান্ত অসহায়-ভাবে আত্মগোপন করে আছে।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট শহর প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্যের জীবন-প্রবাহকে সাক্ষী রেখে আজও সংকট এবং সংশয়ের মধ্যে প্রাণসম্পদে বেঁচে আছে। এই শহরের গা-ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে চলেছে অশান্ত চূর্ণী নদী। চূর্ণী নদীর কলকল শব্দে যদি কোন ভাষা থাকত, তাহলে প্রাচীন এবং আত-আধুনিক জীবনযাত্রার ধারক রাণাঘাট শহরের

মানুষ এই চূর্ণীর তীরে বসেই শুনতে পেতেন এক বিস্ময়কর সত্যাগ্রহের কাহিনী, জানতে পারতেন ক্ষুধার্ত ও আর্ত মানুষের দুঃখে এক মহাজীবনের অশ্রুসজল বেদনার কথা।

রাণাঘাট স্টেশনে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ সরণি ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে জাতীয় সড়কের মুখোমুখি হতে হবে। এই জাতীয় সড়ক ধরে ডানদিকে কয়েক কদম অগ্রসর হলেই চূর্ণী নদীর উপর সেতুটা দেখা যাবে। সেতুটা পেরিয়ে তাঁতশিল্পের গর্বিত সাম্রাজ্য রামনগর—আঁইশতলার দিকে চলতে চলতে বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা পাওয়া যাবে। সেই আঁকাবাঁকা পথ ধরেই উৎসুক মানুষ পৌঁছে যাবেন কলাইঘাটা।

আর এ-পথে না গিয়ে যদি তাড়াতাড়ি যেতে চান, তাহলে জাতীয় সড়ক পেরিয়ে শহরটাকে পিছনে ফেলে সোজা এগিয়ে চলুন মহকুমা হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালকে বাঁয়ে রেখে কয়েক পা হাঁটলেই শহরের মায়া কাটিয়ে গ্রামের সজীব গন্ধ পাওয়া যাবে। তারপর পাকা রাস্তা একসময় হারিয়ে যায়, কাঁচা রাস্তা এসে মিশে যায় নদীর নরম মাটিতে। সেখানেই খেয়াঘাট। খেয়া পেরিয়ে ওপারে কলাইঘাটা।

শোনা যায় লর্ড ক্লাইভ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে মুর্শিদাবাদের দিকে সসৈন্যে এগিয়ে চলার পথে চূর্ণী নদীর তীরে এসে একরাত্রির জন্য তাঁবু ফেলেছিলেন। সেই থেকে লোকে জায়গাটাকে বলত ক্লাইভঘাটা। তারপর কখন কিভাবে সেই ক্লাইভঘাটা আজকের কলাইঘাটায় রূপান্তরিত হল, তা নিয়ে ভাষাবিদ্‌রা গবেষণা করতে পারেন।

চূর্ণী নদী আর এক বিশাল অক্ষয় বটগাছকে সাক্ষী রেখে কলাইঘাটা আজও মানুষের কাছে এক অদম্য আকর্ষণ। নদীয়া জেলার এই এলাকাটা ছিল রানী রাসমণির জমিদারি। নদীর ঘাট থেকে কাঁচা রাস্তা আর ঝোপ-জঙ্গল ডিঙিয়ে গ্রামের ভিতরে গিয়ে

ঢুকলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে রানী রাসমণির কুঠিবাড়ি—যা কালের করাল গ্রাসে আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত। গ্রামের সাধারণ মানুষ জানে সেই কুঠিবাড়ির পরিচয়, আর জানে, এখানে এই কলাইঘাটায় একদিন এসেছিলেন এক প্রেমের ঠাকুর, যিনি মানুষের দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন, মানুষের দুঃখনিবারণে জমিদারের বিরুদ্ধে অক্লেশে করেছিলেন সত্যাগ্রহ এবং সব-শেষে ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে তিনদিন তিনরাত এই কলাইঘাটাতেই বাস করেছিলেন, তাইতো কলাইঘাটার মাটি পবিত্র, কলাইঘাটা তীর্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা জানেন, রানী রাসমণি যেমন প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসও তাঁর 'বাবা'র মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন এক মহাপুরুষকে। তাই মথুরবাবু ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর বিরাট শক্তির সন্ধানও পেয়েছিলেন।

সময়টা সম্ভবত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন এক শীতকাল। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে, এ সম্পর্কে কোন অভ্রান্ত তথ্যপ্রমাণ হাতের কাছে খুঁজে পাইনি, তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে এরকম ধারণাই হয়েছে যে ঘটনাটা ১৮৬৯-এর আগে সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে পরে আরও দু-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করব—তাতেই আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে।

সেবার মথুরবাবু খবর পেলেন, নদীয়া জেলায় তাঁদের জমিদারি এলাকায় পরপর দুবছর খরা হয়েছে, মাঠের ফসল মাঠেই পুড়ে ছাই। প্রজারা চরম অভাবের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তাই খাজনা দিতে পারছে না। এই ঘটনা থেকেও মনে হয়, সময়টা ১৮৬৭ বা ৬৮-র মধ্যেই হবে। কারণ নদীয়ার প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা গেছে, ওই সময়েই ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি মানুষকে দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল।

এমন দুঃসংবাদ পেয়ে মথুরাবাবু ঠিক করলেন, তিনি নিজেই

যাবেন জমিদারিতে, নিজেই দেখতে চান, কেন প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। নৌকা (বজরা) করে গঙ্গা দিয়ে গিয়ে চূর্ণীতে ঢুকবেন। তারপর কলাইঘাটার কুঠিবাড়িতে গিয়ে উঠবেন।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকেও সঙ্গে নিলেন। আগেও এরকম নিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য, 'বাবা' দুদিন বেড়িয়ে আসবেন।

পাইক বরকন্দাজ লোকলস্কর নিয়ে মথুরবাবুর বজরা এসে এক-সময় ভিড়ল কলাইঘাটার ঘাটে। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে খবর রটে গিয়েছিল যে, জমিদার আসছেন। তাই নদীর ধারে প্রজারা এসে সকাল থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করল। দূর দূর গ্রাম থেকে সকলেই এসেছে জমিদারকে দেখতে, এবং তাদের দুর্দশা জমিদারকে দেখাতে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় সাধারণ মানুষ জানে না, তখন তাঁর পরিচয়: তিনি দাক্ষণেশ্বরে রানী রাসমণির বিরাট মন্দিরের পূজারী।

বংশ পরম্পরায় কলাইঘাটার মানুষ সেদিনের সেই ঘটনার কথা জেনে এসেছে। তাঁদের কাছ থেকেই সেদিনের বর্ণনা আমি শুনেছি।

বজরা এসে কলাইঘাটায় ভিড়ল। জমিদার নামলেন পাইক-বরকন্দাজ পরিবৃত হয়ে। এগিয়ে চললেন তিনি কুঠিবাড়ির দিকে। সমস্ত মানুষ তাকিয়ে আছেন সেদিকে। কারোর খেয়ালই নেই, সকলের অলক্ষ্যে বজরা থেকে নেমে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন নদীর তীরে দাঁড়ানো সারি সারি কঙ্কালসার মানুষের দিকে। মথুরবাবু এগিয়ে গেলেন বেশ কিছুটা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ নদীর নরম মাটিতে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছেন দুর্ভিক্ষের গুহা থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা সহস্র মানুষকে। তাঁর দুচোখে জলের ধারা—চূর্ণীর উত্তাল তরঙ্গ তখন কলকল শব্দে প্রবাহিত।

একসময় দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি মথুরবাবুর কাছে। পিছন থেকে ডাকলেন তিনি—মথুরবাবু ফিরে তাকালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : এরা কারা ? ওই যে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে বস্ত্রহীন, অন্নহীন রুক্ষ কঙ্কালসার মানুষ— ওরা কারা ?

মথুরবাবু উত্তর দিলেন : ওরা আমার প্রজা।

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে বিস্ময় : এরাই তোমার প্রজা ? তুমি এদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবে ? কিন্তু এরা নিজেরাই যে খেতে পায় না।

নদীর নরম মাটির বুকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে কঠিন হলেন তিনি। ক্ষুধার্ত মানুষের পয়সা দিয়ে যে ভবতারিণীর পূজা হয়—সেখানে তিনি আর পূজারী থাকতে রাজি নন। অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বার্থে সেদিন তিনি সত্যাগ্রহী—স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে জোর করে যদি খাজনা আদায় করা হয়, তাহলে তিনি আর ফিরে যাবেন না দক্ষিণেশ্বরে। আজীবন থাকবেন তিনি এই ক্ষুধার্ত দেবতার সংসারে।

সেদিন যাঁদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল— তাঁদেরই বংশধররা আজও কলাইঘাটায় আছেন। "কথামৃত" বা "লীলা-প্রসঙ্গ" তাঁরা পড়েননি—কিন্তু সর্দার বংশসম্ভূত সেই "বুনো" পরিবারগুলি জানে এই পরম করুণাঘন মানুষের দেবতাটিকে—যিনি তাঁদের দুঃখে কেঁদেছিলেন, তাঁদের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, গ্রামের প্রবীণ মানুষের মুখ থেকে যে কাহিনী শুনেছি, সেই একই কাহিনী পড়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী শিবানন্দের পত্রে। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁকে এই পত্র লিখেছিলেন, "উদ্বোধনের'র শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে সেই পত্রের কিছুটা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত।

শিবানন্দজী লিখেছেন : "ক্রমাগত দুই বৎসর জমিতে ফসল না হওয়ায় প্রজাগণ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। প্রজাগণের

অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ আকৃতি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় গভীর দুঃখে অভিভূত হইল। তিনি মথুরবাবুকে ডাকাইয়া হতভাগ্য প্রজাদের খাজনা মাপ করিয়া তাহাদিগকে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতে ও বস্ত্র দান করিতে অনুরোধ করিলেন। মথুরবাবু বলিলেন, 'বাবা, আপনি জানেন না পৃথিবীতে কত অধিক দুঃখ ক্লেশ আছে! তাই বলে প্রজাদের খাজনা মাপ করা যায় না।' শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'মথুর, তোমার নিকট জগন্মাতার ধনসম্পদ গচ্ছিত আছে বইত নয়। ইহারা জগন্মাতার প্রজা; জগদম্বার অর্থ ইহাদের দুঃখদূরীকরণার্থ ব্যয়িত হউক। ইহারা অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহাদের সাহায্য করিবে না? তোমাকে নিশ্চতই ইহাদের সাহায্য করিতে হইবে।' মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতারজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সুতরাং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন।"

রামকৃষ্ণ-সন্তান এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয়ভাই শিবানন্দ মহারাজ উক্ত চিঠিতে রাণাঘাটের ঘটনাটি উল্লেখ করেই দেওঘরের সন্নিহিত এলাকার একই ধরনের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। দুটি ক্ষেত্রেই ঠাকুর মথুরবাবুকে দিয়ে জীবসেবার ব্রত পালন করিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীদর্শনে যাচ্ছিলেন, পথে দেওঘরের সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাক্ষাৎ পেলেন. বললেন, "যে পর্যন্ত ইহাদের দুঃখ দূর না হইবে সে পর্যন্ত আমি ইহাদের সঙ্গে এখানেই বাস করিব, এ স্থান ছাড়িয়া যাইব না।" শেষ পর্যন্ত মথুরবাবু সেবাব্রত পালন করেন।

রাণাঘাট ও দেওঘরের ঘটনা দুটির মধ্যে প্রথম কোন্‌টি? শিবানন্দজী তাঁর পত্রে দেওঘরের ঘটনাকে "দ্বিতীয়" ঘটনা বলেই উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: "আমি তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) শ্রীমুখ হইতে এই দুই ঘটনার কথা শুনিয়াছি।" "বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়" জীবনপাত করার জন্য যাঁরা সেদিন দক্ষিণেশ্বরের মহাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনধন করে সমবেত হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ত্যাগী সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্যই

সম্ভবত ওই দুটি ঘটনার কথা নিজেই তাঁদের কাছে বলেছিলেন।

কলাইঘাটার এই ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ উল্লেখ আমরা স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ"-এ দেখতে পাই, দেখতে পাই স্বামী তেজসানন্দের "রামকৃষ্ণ জীবনী প্রসঙ্গে"ও। স্বামী তেজসানন্দ বলেছেন: "ওই গ্রামটির নাম যে কলাইঘাটা, সেটা ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় বলেছিলেন।" স্বামী সারদানন্দজী "লীলাপ্রসঙ্গে" লিখেছেন: এই সঙ্গে দেওঘর ও "রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁর জমিদারিভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময় বেড়াইতে যাইয়া গ্রামবাসীদের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণা আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।"

দেওঘরের ঘটনা যদি "দ্বিতীয় ঘটনা" হয়, তাহলে রাণাঘাটের ঘটনা নিশ্চিতভাবেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে। কারণ, "রামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা" (২য়) গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৮) স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন: "ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের মধ্যভাগে (ইং ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮) ঠাকুর তীর্থযাত্রা করিলেন।" ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন মথুর এবং জগদম্বা দাসী। এই সময়েই দেওঘরের ঘটনা। দেওঘরের পর যে রাণাঘাটের ঘটনা নয়, সেটা আরেকটা কারণেও মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ইংরেজী ১৮৬৮-তে কিংবা বাংলা ১২৭৪ সনে তীর্থদর্শনে গেলেন, ফিরে এলেন ১২৭৫ সনে। তারপর ১২৭৭ সনে নবদ্বীপ গেলেন। আর ১২৭৮ সনে মথুরবাবু দেহত্যাগ করলেন। মথুরবাবুর মৃত্যুর আগে এই সময়ের মধ্যে যে তিনি রাণাঘাট গিয়েছিলেন, তেমন প্রমাণ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যু হলে বাংলা ১২৭৬ সনে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুর সঙ্গে জমিদারিতে গিয়েছিলেন—কিন্তু সেটা যে রাণাঘাট, তেমন কোন উল্লেখ পাইনি।

এখানে আরেকটি ঘটনার কথাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কলাইঘাটায় যে নরনারায়ণ সেবার ব্রত পালন করেন, সেটা

কেশবচন্দ্র সেনকেও প্রভাবিত করে এবং এই কলাইঘাটাতেই পরবর্তী কালে "নরপূজা" প্রসঙ্গ নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং কেশবচন্দ্র সেন আলোচনাও করেন। এক্ষেত্রে আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত" অনুসরণ করতে পারি (পৃঃ ৯৫), যেখানে তিনি লিখেছেন : "১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী (বিজয়কৃষ্ণ) তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া যখন আবার কেশববাবুর সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটা নামক স্থানে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটা উৎসব হয়। ঐখানে গোঁসাইজী তখন সপরিবারে বাস করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাহ্মের সহিত সেদিন সেখানে গমন করি। তৎপূর্বে কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎভাবে আমার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। সেই উৎসবক্ষেত্রে আলোচনাস্থলে নরপূজার আন্দোলন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল।"

এই বিবরণ থেকেও এমন সিদ্ধান্তে আসা অসঙ্গত হবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ততপক্ষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন এক সময় রাণাঘাটে গিয়েছিলেন এবং নরপূজার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন —যে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তী কালে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে বিশ্বের ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে।

রাণাঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ এবং দরিদ্র দেবতার পূজা—এই দুটি ঘটনাকে সামনে রেখে রাণাঘাট শহরে একদল যুবকের ঐকান্তিক প্রেমে গড়ে উঠেছে "শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ স্মারক সমিতি"। বহুদিনের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদার্পণের স্থানটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এবং সেখানে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী একটি প্রস্তর ফলকও প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতি বছর পালন করা হয় রামকৃষ্ণ উৎসব। রাণাঘাট শহরে স্থাপিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি। মোট কথা, রাণাঘাটকে কেন্দ্র করে নদীয়ায় আজ নতুন আবেগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের তরঙ্গ জনজীবনে সৃষ্টি করেছে আলোড়ন।

বর্তমান সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন

প্রচলিত অর্থে দার্শনিক বলতে যা বুঝায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিত-ভাবেই তা' ছিলেন না। অথবা, নির্দিষ্টভাবে তাঁর কোন সমাজদর্শনের সূত্রও নেই। কিন্তু যিনি সমগ্র দেশ ও সমাজের "মোড় ফেরাতে" অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি বিশ্বজনের উদ্দেশে বলতে এসেছিলেন, "চৈতন্য হোক"—তাঁর সমগ্র জীবন এবং জীবনী অবশ্যই কতকগুলি অনাস্বাদিত ভাবাদর্শ এবং অনাঘ্রাত জীবনদর্শনের দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "লাভ পারসনিফায়েড" —প্রমূর্ত প্রেম। আবার বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক ঈশারউডও বলেছেন "ফোনোফেনন"—সত্যিই তো তাই।

ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আগেও অনেক সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন এবং স্ব-স্ব মাহাত্ম্যে ও ক্ষেত্রে তাঁরাও পূজনীয়। কিন্তু তাঁদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি, সিদ্ধিলাভ বা পরমপ্রাপ্তির পর তাঁরা লোকজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মগত জীবনে আত্মস্থ হয়েছেন। সমাজ, সংসার বা মানুষের কাছ থেকে ধীরে ধীরে তাঁরা সরে গেছেন নিজেদের সমাজ-নিরপেক্ষ পরিমণ্ডলে। সেটাই ছিল তাঁদের সাধনালব্ধ জীবনে পরম প্রার্থিত।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? পাই কোন্ ভিন্নতর উপলব্ধির মহিমা?

সিদ্ধিলাভের পর এবং সর্বধর্ম-অনুভবের বিস্ময়কর সাধনায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বর কুঠি বাড়ির ছাদে

দাঁড়িয়ে, কলকাতার দিকে মুখ করে আকুল কণ্ঠে ডাকতেন : "তোরা আয় আয়।" তাঁর কাছে কেউ আসুক বা না আসুক, তিনিই ডাকছেন বিশ্বমানুষকে।

চলমান যুগ বা বহমান কালকেই শুধু নয়, মোহাচ্ছন্ন অনাদি অনন্তকালকেই যেন তিনি দুহাত বাড়িয়ে ডাকতেন। সেই ডাক আজও বিশ্বসংসারের কানে কানে ধ্বনিত হচ্ছে। অনুরণিত হচ্ছে হতাশাদীর্ণ বা অবিশ্বাসী হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে।

তিনি সিদ্ধিলাভ করার পর মানুষের কাছ থেকে সরে গেলেন না, বরং এক পা এক পা করে মানুষেরই কাছে এগিয়ে গেলেন। ধর্ম সমাজ-নিরপেক্ষ নয়—এই সত্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন স্বমহিমায়। সমাজ-সংসারের কেন্দ্রভূমিতে পাতা হল সাধনার রাজসিংহাসন।

তাঁর ডাকে সে যুগের মানুষ সেদিনের নির্জন নদীতটে সংস্থাপিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে সমবেত হলেন, এলেন সে যুগের অনেক শ্রেষ্ঠ মণীষী, এলেন সে যুগের সেরা যুবকের দল। এলেন "কলমির দল"—অবতারের তাঁরাই লীলাসঙ্গী। সেই নরেন্দ্রনাথ রাখালের সমারোহ।

কিন্তু তবুও তো শ্রীরামকৃষ্ণের মন তৃপ্তি পায়নি। তখনও তো অনেকেই আসেন নি।

এবার তিনি স্বয়ং চললেন কলকাতায়—যাঁরা আসেন নি, তাঁদেরই দরজায় দরজায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এভাবে সমাজের মর্মমূলে আত্মনিবেদনের নজির আর কি কোথাও পাওয়া যাবে?

সে যুগের সমাজ জীবনে দু'টি প্রশ্ন এক ভয়ঙ্কর সংশয় এবং সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। একটি প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর যদি সত্যি থাকবেন, তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না কেন? আর যা' প্রত্যক্ষ সত্য নয়, তাকে বিশ্বাস করব কেন? মেনে নেব কেন? বিজ্ঞানের সত্যমূল্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচারের মানসিকতাই তখন প্রবল হয়ে দেখা দিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : ধর্ম যদি সত্যই হবে, তাহলে ধর্মে ধর্মে এত বিরোধ কেন? এক ধর্মের সঙ্গেই বা অন্য ধর্মের বিরোধ ঘটবে কেন? কেন ধর্মের নামে সংঘর্ষ এবং এত রক্তপাত?

এই দু'টি প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু সেদিনের ভারতবর্ষ নয়, সেদিনের বিশ্বও অসহায় আত্মসমীক্ষায় বিব্রত হয়ে পড়েছিল। যেমন বর্তমান ভারত বা বিশ্ব অসহায় হয়ে পড়েছে। মহামহা পণ্ডিতরাও তর্কজালের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, পারলেন না মূল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে।

অথচ সেদিনও যেমন কামারপুকুরের প্রায় নিরক্ষর গদাধর চট্টোপাধ্যায় স্বীয় সাধনার সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে বিশ্বজনের সামনে নিতান্তই সহজ-সরল ভাষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওই দু'টি ভয়ঙ্কর প্রশ্নের অপরূপ উত্তর দিয়েছিলেন, আজও তেমনি সেই দু'টি উত্তরই সংঘাতে বিদীর্ণ আধুনিক বিশ্বে আমাদের সামাজিক সংশয় এবং সঙ্কটের সমাধানে সক্ষম।

সেদিনের সংশয়াচ্ছন্ন এবং অবিশ্বাসী মানুষের প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথ দত্তের স্পষ্ট প্রশ্ন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে : আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

এই একই প্রশ্ন নিয়ে নরেন্দ্রনাথ,পরবর্তী কালের স্বামী বিবেকানন্দ সমকালের খ্যাতিমান বহু সাধকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, উপস্থিত হয়েছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান মহর্ষিদেবেন্দ্রনাথের কাছেও। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ছিল তাঁর একই প্রশ্ন : আপনি যে ঈশ্বরতত্ব বলছেন, আপনি কি দেখেছেন ঈশ্বরকে?

কোথাও তিনি স্পষ্ট উত্তর পেলেন না, পেলেন না কোন যুক্তিগ্রাহ্য উত্তরও। তবু তাঁর ক্লান্তিহীন অন্বেষণের শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সাতটাকা বেতনের পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে—যিনি সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় কথা বলেন, রাশি রাশি শাস্ত্র পড়ে হননি পণ্ডিত।

প্রশ্ন যতখানি প্রত্যক্ষ ছিল, উত্তরও ছিল ততখানি প্রত্যক্ষ। তিনি নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন: "হ্যাঁ, ঈশ্বরকে দেখেছি।" সত্য দর্শনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।

কিন্তু এটুকু বলেই তিনি থেমে গেলেন না। তিনি এগিয়ে গেলেন আরেক ধাপ, বললেন, ঠিক তোমাকে যেমন দেখছি, ঈশ্বরকেও সেরকম দেখি, তাঁর সঙ্গে কথা বলি। আর যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকেও দেখাতে পারি। এই বোধহয় প্রথম একজন মানুষ সরাসরি বললেন অন্যজনকে: যদি তুমি চাও, তোমাকেও দেখাতে পারি ঈশ্বর।

অর্থাৎ, ঈশ্বরও প্রত্যক্ষ সত্য। যদি কোন মানুষ মনপ্রাণ সমর্পন করে ঈশ্বর-সাধনায় আত্মলীন হয়, তাহলে তিনিও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। বিজ্ঞানের সত্য জানার জন্য যেমন সাধনা প্রয়োজন, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জানার জন্যও তেমনি সাধনা প্রয়োজন— শ্রীরামকৃষ্ণ সংশয়াচ্ছন্ন মানুষকে স্বীয় জীবনের কালজয়ী সাধনার সম্পদে সেই সহজ সরল কথাটাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আর বললেন, "যত মত তত পথ।" সব মত, সব পথ একই ঈশ্বরের লক্ষ্যে ধাবিত। সব ধর্মই সত্য এবং সব ধর্মই সেই একই ঈশ্বরের দিকে মানুষকে নিয়ে যেতে চায়। তাহলে ধর্মে ধর্মে এত বিরোধ কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কাউকে বর্জন করেননি, কাউকে বাতিল করেননি, সকলকে বরণ করেছেন, সকলকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সবটুকুই পজিটিভ। নিজেরটা সত্য, অপরেরটা মিথ্যা, অথবা, "আমার ধর্মই একমাত্র সত্য"—এমন কথা যাঁরা বলেন বা বলেছেন, তাঁরাই ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছেন, মানুষকে মানুষের কাছ-থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। আর তারই ফলে যত বিদ্বেষ, যত সংঘর্ষ।

সকলকে মেনে নেওয়া, সকলকে সম্মান দেওয়া এবং সকলের

মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করা—শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমাজদর্শনের পথেই সম-দর্শনের রাজপথ তৈরি করেছেন, যে পথ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ ঘটায়, যে পথ মানুষের অপহৃত মনুষ্যত্বের করে প্রতিষ্ঠা।

আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান এক অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির মূল ধারণাটি কি? সামান্য অনুশীলনেই দেখতে পাব, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির মূল ধারণাটি হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অনুভূতি। অর্থাৎ যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ সাপেক্ষ। শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা আগেই দেখেছি, ঈশ্বর যে প্রত্যক্ষ সত্য, সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই প্রমাণ করেছেন। তাঁর জীবনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রমাণ বারবার পাই। তবে তিনি যে যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—সেটি একটু আলাদা। সাধারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বস্তুবিষয়ক জ্ঞান অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য—সেইজন্য তার গবেষণাগারও স্বতন্ত্র।

কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে যন্ত্র সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত দেহ ও মন। শুধু মাত্র বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নয়, এই ব্যক্তিগত দেহ ও মনের সাহায্যেই তিনি যেমন আধ্যাত্মিক জীবনে পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তেমনি তাঁর শিষ্যদেরও সেই সত্যের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন,

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মের কথা বললেন, সেই ধর্মে জিজ্ঞাসা ও যুক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে এবং তারই ফলে সেই ধর্ম পরিণত হয়েছে বৈজ্ঞানিক সত্যে।

আরেকটি মহান সত্যও তিনি বিশ্বমানবের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

ব্যক্তি স্বাধীনতাই হল গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষই প্রকৃতিগতভাবে মুক্তি চায় এবং আধুনিক মন চায় পরিপূর্ণ

বিকাশের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু এই আধুনিক যুগেও অধিকাংশ ধর্মেই ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিমানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ অনুপস্থিত। প্রতিটি ধর্মগোষ্ঠীই চায়, তার নিজের নীতি ও পদ্ধতি বিনা প্রশ্নে সকলে কঠোরভাবে পালন করে চলুক।

আবার কোন কোন ধর্ম মনে করে, তার ধর্মই একমাত্র নির্ভেজাল, অন্যগুলি ভেজালের কারবার। এই ধর্মগুলি চায়, সকলে বিনা বিচারে তাদের মত ও উপদেশ গ্রহণ করুক ও মেনে চলুক। যদি কেউ ওই সব উপদেশ ও মতের বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে বা প্রশ্ন তোলে, তাহলেতো আর রক্ষা নেই। এই সব ধর্ম বা ধর্মমত যে গণতন্ত্র বা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মের কথা বললেন, সেই বৈদান্তিক ধর্ম এক উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম কি? ধর্ম হল মানুষের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভ। এবং এই পরিপূর্ণতা লাভের জন্য আচার অনুষ্ঠানের বেড়াজাল কোন প্রয়োজনেই লাগে না।

তিনি বললেন, "বনে মনে এবং কোণে" ধর্মচারণ করতে। বনে যেতে পার ভালো, নইলে মনে মনেই ঈশ্বরের নাম কর। অথবা ঘরের কোণে বসে নিজের মনে। ধর্ম নিতান্তই ব্যক্তি মানুষের সম্পদ —একজন মানুষ নিজের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী সেই ধর্ম পালন করবে। ধর্মকে ভিত্তি করে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজদর্শন তাই পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক, যা আধুনিক মনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু আজকের পৃথিবীতে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সমষ্টিগত নিরাপত্তার প্রশ্নটিও গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। অনেকে অনেক সময় ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাকে সমষ্টিগত নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক বলেও ফারমান জারি করেছেন। তাঁরা এমন মতও প্রচার করেন বা করেছেন যে, সমগ্র মানবজাতি একই ধর্মের পতাকাতলে এসে আশ্রয় নিলে তবেই বিশ্বের মঙ্গল।

এরকম চিন্তাধারা কখনও কখনও সংঘর্ষ এবং রক্তপাতের পথে মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে। ধর্ম কল্যাণের পথ না হয়ে একেবারে ভয়ঙ্কর অকল্যাণের পন্থা হয়ে উঠেছে। আর তারই ফলে ধর্মান্তরিত করার প্রবণতা হয়েছে প্রবল।

কিন্তু তাই বলে কি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে সমষ্টিগত নিরাপত্তাকে বিসর্জন দেওয়া হবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বিষয়টিকে একটু বুঝে দেখা প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজিত—এই বোধ মানুষের মধ্যে আসে কখন? যখন একজন মানুষ ধর্মীয় সত্যের সার্থক উপলব্ধিতে জীবনের উচ্চশিখরে উঠতে পারেন, তখনই তিনি সর্বজীবের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। প্রত্যেকের মধ্যেই যখন ভগবান আছেন, সকল ধর্ম যখন একই ঈশ্বরের দিকে বহতা নদীর মতই প্রবাহমান—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ ঘটবে কেন, সমষ্টির হাতে সমষ্টির নিরাপত্তা বিঘ্নিত কেন হবে? সমান্তরাল পথে কেন মানুষ চলবে না নিজের নিজের লক্ষ্যে?

ব্যক্তি যদি ব্যক্তির স্বার্থ হানি না করে, এক ধর্ম যদি অন্য ধর্মকে গ্রাস করতে উদ্যত না হয়, একজনের বিশ্বাস জোর করে যদি অন্য-জনের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলেই সমষ্টিগত নিরাপত্তার সমূহ সমস্যার সমাধান সূত্রটি পাওয়া সম্ভব।

সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের জীবনে সকল ধর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন, ব্যক্তিগত মুক্তি সমষ্টিগত নিরাপত্তার পথে কোন অবস্থাতেই প্রতিবন্ধক নয়, বরং একটি অপরটির পরিপূরক এবং এই দু'টির মিলনেই একেশ্বরবাদের সৃষ্টি করে।

বিশ্বের ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বিশেষ দিক থেকেও এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত মানুষকে "দয়া" বা "চ্যারিটি" করার কথা অনেক ধর্মই বলেছে,

বলেছেন অনেক ধর্মনায়কও। কিন্তু সে তো শুধু দয়া দাক্ষিণ্যের ব্যাপার। একজন দাতা, অন্যজন গ্রহীতা—দু'য়ের মধ্যে ভেদরেখাটি সুস্পষ্ট এবং সবল।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই পটভূমিকায় দেখালেন নতুন পথ, শোনালেন নতুন মন্ত্র। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণব ধর্মের সেই "জীবে দয়া, নামে রুচি" ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে কথা শুরু করেছিলেন কয়েকজন। "জীবে দয়া" কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে গেলেন ভাবসমাহিত। তারপর যখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, তখন তিনি আত্মগতস্বরে বলছেন, "জীবে দয়া, জীবে দয়া—কে কাকে দয়া দেখায়? জীবে দয়া দেখাবার তোমরা কে? কেউ কাউকে দয়া দেখাতে পারে না, একজন আরেকজনের প্রতি কর্তব্য পালন করতে পারে না।"

তিনি শোনালেন, জীবে দয়া নয়, "জীবে সেবা। মানুষ ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ। তাই জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা কর।"

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসভায় শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরই একজন নরেন্দ্রনাথ দত্ত—যিনি পরে বললেন, "গুরুর এই কথায় এক অপূর্ব আলোক আমি প্রত্যক্ষ করি।" কথাগুলি ভক্তিমার্গে সম্পূর্ণ নতুন আলোকসম্পাত করে। ঈশ্বরকে সকল জীবে প্রত্যক্ষ করা এবং মানবতার মন্ত্রে "তাঁর" সেবা করা—ভক্তিমার্গীর পক্ষে ভক্তি অর্জনের এ এক নতুন পথ।

স্বামী বিবেকানন্দ এই ঘটনা থেকে নতুন সত্যের সন্ধান পেলেন, বললেন, "যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে, তবে আমি এই চরম সত্যকে জগতের কাছে তুলে ধরব। একে আমি সাধারণের সম্পত্তি করব—জ্ঞানী বা মূর্খের, ধনী বা দরিদ্রের, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের।" প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের পথনির্দেশকে সম্বল করেই স্বামী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন ঘরে। একেবারে সমাজের প্রাণকেন্দ্রে। "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়" আত্মদানের সঙ্কল্প

ঘোষিত হল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে। আর সেই সঙ্কল্প বাস্তবায়িত করার জন্যই গড়ে উঠল সংঘজীবন। ভারতের ধর্ম তথা সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে যুক্ত হল নতুন অধ্যায়।

আমরা আগেই দেখেছি রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটার ঘটনা—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দুঃখী ও পীড়িত মানুষের জন্য সত্যাগ্রহী হয়েছিলেন এবং শিবজ্ঞানে জীব সেবার এক মহৎ আদর্শ ও নজির স্বহস্তে সংস্থাপন করেছিলেন। মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃখ শুধু কর্মফলের পরিণাম নয়, শোষণের পরিণতি—আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের এই সূত্রটি বহু আগেই বিধৃত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে।

ভগবানকে আরাধনার মানসিকতায় মানুষের সেবা করবো—শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী আধুনিক বিশ্বে গভীর সম্ভাবনাময়। এই বাণীর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, যাকে শিবজ্ঞানে সেবা করা হবে, সেই শুধু উন্নততর জীবনে উন্নীত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে যিনি সেবক, তিনিও তাঁর আধ্যাত্মবাদী মনোভাবের জন্য সমপর্যায়ে উত্থিত হবেন। এই পটভূমিকায় ধার্মিক এবং আধ্যাত্মিকের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না। মানুষের প্রতিটি কাজই হয়ে উঠবে পূজার সমান, কর্মই পরিণত হবে আরাধনায় এবং এই আধ্যাত্মসাধনাই আধুনিক বিশ্বের সংশয়সঙ্কুল মানুষের জীবনকে করে তুলতে পারে অর্থবহ। তা' না হলে ধর্মের নামে প্রসারিত সংকীর্ণতার বেড়াজাল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হয় করে তুলবে মলিন, নয় ব্যর্থ।

একদিকে ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং অন্যদিকে বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ ও শক্তি, এই দ্বিমুখী আগ্রাসী আক্রমণ যখন আধুনিক সমাজ ও জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে উদ্যত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের মহাকালজয়ী জীবনদর্শন আমাদের সামনে নিষ্কম্প প্রদীপের মতই প্রজ্বলিত। এই আলোকশিখাই দেশে দেশান্তরে একটি জীবন থেকে ভিন্ন জীবনে কিভাবে আলোর বার্তাটি পৌছে দিচ্ছে, তা' আমরা দেখব পরবর্তী অধ্যায়ে। আপাতত সে প্রসঙ্গে মুলতুবি থাক।

ত্যাগ এবং সেবার জীবন্ত প্রতিমূর্তি পরম প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "ভারতের জাতীয় আদর্শ হল ত্যাগ ও সেবা।" "কাচা আমি"কে ত্যাগ করে "পাকা আমি"কে ধরা—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শনে এই হল ত্যাগের আদর্শ। আগে আসে ত্যাগের ভাব, তারপর আসে সেবার ভাব।

জননী সারদামণি বলছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব এই যে, তিনি হলেন ত্যাগের প্রতিমূর্তি।" প্রেম ও সেবার পথ ধরেই যে ত্যাগের ভাবটি জীবনে মহত্বর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেটি সারদামণি নিজের জীবনেই প্রমাণিত করেছেন। জ্ঞান-যোগী জোর করে সব ত্যাগ করতে প্রয়াসী হয়, কিন্তু ভক্তিযোগী তাকে প্রেমের পথে স্বাভাবিক করে তোলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভক্তিযোগে বলেছেন, "ত্যাগ ভালোবাসার মাধ্যমে মধুরতম মূর্তি ধারণ করে।" শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনে অনুভূত এই জীবনসত্য সারদামণির জীবনেও প্রস্ফুটিত। তাই তিনি ছিলেন "সতের মা, অসতেরও মা" ছিলেন "ভালোর মা, মন্দেরও মা"—কেউ তাঁর কাছে পাপী নয়, কেউ তাঁর কাছে বর্জিত নয়। হৃদয়ভরা ভালোবাসা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন, মা সারদাও সেই ভালোবাসার সম্পদেই হয়ে উঠেছিলেন সকলের মা। তাই সেই ভালোবাসার ফলেই মুসলমান ডাকাত আমজদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান স্বামী সারদানন্দজীকে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, বসাতে পেরেছিলেন সমআসনেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং জননী সারদাদেবী সংসারী মানুষের কাছে কতকগুলি আদর্শ স্থাপন করতেই যেন এসেছিলেন। তাই তাঁদের জীবন এবং জীবন-দর্শন আজকের সমাজে এক অনুসরণীয় পন্থা।

এক্ষেত্রে একটি সত্য অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন এবং সেটি হচ্ছে এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জলন্ত এবং জীবন্ত বিগ্রহ হয়ে যেমন ত্যাগ ও সেবার আদর্শটি সমাজ-সংসারের কাছে সংস্থাপিত করেছেন, তেমনি

সঙ্গে সঙ্গে একথা বলতেও বিস্মৃত হননি, "মা আমায় রসে বশে রাখিস, আমায় শুকনো সন্ন্যাসী করিস না।" তাঁর এই উক্তিটিকে নিছকই কোন বিক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ যা সহজাত আনন্দবোধের প্রকাশ বলে মেনে নিলে সেটা সঠিক হবে না বলেই মনে হয়।

কারণ, তাঁর এই উক্তির সঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে তাঁর ঐতিহাসিক চেতনাও। যিনি নতুন যুগ এবং নতুন সমাজ প্রবর্তন করতেই পৃথিবীতে এসেছিলেন, এসেছিলেন মানুষকে পথ দেখাতে—তিনি অতীতের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

আমরা জানি, ভগবান বুদ্ধদেব দুঃখকেই বড় করে দেখেছিলেন, বলেছিলেন, দুঃখ আছে, দুঃখ নিবৃত্তির পথও আছে। সন্ন্যাসের মাধ্যমে নির্বাণই ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে, পরবর্তী যুগের বৌদ্ধশ্রমণরা মানতে পারেন নি সেই তত্ত্ব। শিল্পের মধ্য দিয়েই তাঁরা দুঃখ থেকে মুক্তির পথ, আনন্দের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, যার প্রমাণ বিধৃত হয়ে আছে অজন্তা গুহা চিত্রে এবং বৌদ্ধ স্তূপগুলিতে।

আবার, ইসলাম ধর্মে সঙ্গীত নিষিদ্ধ। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সেই নিষেধ মানা হয় না। কিন্তু ভারতের মুসলমানরা তাঁদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সেই নিষেধকে মেনে নিতে পারেন নি। অন্তরের অন্তর্নিহিত সুকুমারবৃত্তির প্রকাশ ঘটাতে তানসেন থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের অনেক মুসলমানই সঙ্গীত সাধনাকে জীবন সাধনায় রূপান্তরিত করেছেন। এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ খ্যাতি ও শ্রদ্ধায় প্রবাদপুরুষ।

ব্রাহ্মসমাজের কঠোর নীতিবাদের প্রসঙ্গটিও এই পটভূমিকায় উল্লেখের দাবি রাখে। আমরা জানি, ব্রাহ্মসমাজের সেই কঠোর নীতিবাদকে উপেক্ষা করেই রবীন্দ্রনাথ জীবনজুড়ে আনন্দের পসরা সাজিয়েছেন এবং তাঁর গান, নাচ, শিল্প ও নাটকে সেই আনন্দের দ্বার সর্বজনের জন্য করে দিয়েছেন উন্মুক্ত।

আসলে, ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনা বা জীবন সাধনায় ত্যাগ এবং আনন্দ একই লক্ষ্যের অভিসারী। একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু আনন্দ—যেখানে ত্যাগ নেই, সেটিও কাম্য নয়। সেটি নয় সার্থকও। আবার শুধু কঠোর ত্যাগ—যেখানে আনন্দ নেই—সেটিও প্রার্থিত নয় মানুষের জীবনে। ভারতের আর্যঋষিরা তাই ঈশ্বরকে বলেছেন "আনন্দস্বরূপ" "রসস্বরূপ" এবং ব্রহ্মকে দিয়েছেন "আনন্দ" অভিধা। তাঁরা জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন আনন্দময় ব্রহ্মেরই প্রকাশ হিসেবে।

তাই আনন্দময় ত্যাগব্রতী ভারতবর্ষ আনন্দবিহীন ত্যাগের বৌদ্ধনির্বাণকে মেনে নিতে পারেনি, আবার ত্যাগবিহীন আনন্দের বার্তাবাহী চার্বাক দর্শনও এদেশের মাটিতে শিকড় বসাতে পারেনি।

সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনদর্শনে আমরা এক পরিপূর্ণ "আনন্দঘন সন্ন্যাসীর" দেখা পাই, যিনি সমাজদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ত্যাগ ও আনন্দের সমন্বিত প্রতিমাকে করেছেন সমহিমায় প্রতিষ্ঠা।

অমৃতসমান কথামৃত

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবনের শেষপর্ব তখন। দেহান্তের আর মাত্র চার বছর বাকি। দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছে সর্বমানবের মহামিলন ক্ষেত্র। সেই ঐতিহাসিক লগ্নে শ্রীম এসে উপস্থিত দক্ষিণেশ্বরে। সে যুগের উচ্চ শিক্ষিত এই যুবক তাঁর আসল নাম মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে সতর্ক নিষ্ঠায় আড়ালে রেখে শ্রীম বা ইংরেজিতে 'এম' শব্দের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভাবীকালের জন্য এক মহান দায়িত্ব পালন করতেই যেন সেদিন তিনি ক্লান্তিহীন অন্বেষণের চোখ নিয়ে রামকৃষ্ণ সভার পার্ষদ হন।

তাঁরই একান্ত আপনজন নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে প্রথম শোনেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সেদিনটি ছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি। তার আগে তিনি এসেছিলেন কিনা, জানা যায় না। সেদিন থেকেই তাঁর ডায়েরি লেখা শুরু। শেষ হয় ১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ চার বছরে পঞ্চাশটির মতো দেখা-সাক্ষাতের নিপুণ এবং অননুকরণীয় বিবরণ শ্রীম পরম নিষ্ঠায় লিখে রেখেছিলেন তাঁর ডায়েরিতে—যা পরে রামকৃষ্ণ কথামৃত নামে প্রকাশিত এবং কালের বিচারে এক মহৎ জীবনী সাহিত্যে পরিণত হয়।

শুধুই কি ধর্ম বা জীবনী সাহিত্য? পাঁচ খণ্ডে গ্রথিত কথামৃত কি সমকালের প্রত্যক্ষ ইতিবৃত্তও নয়? সেকালের কত মানুষ, কত মনীষী এই কথামৃতের পাতায় এসে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। হয়েছেন ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। কথামৃত প্রথমভাগের ভূমিকায়

শ্রীম বলেছেন: শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়েছিলেন তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত, বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম…"এই জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন"। এভাবে রচিত হয়েছে বলেই সমকালের সকল মানুষই এই গ্রন্থকে অভ্রান্ত ইতিহাস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। অন্য কারোর কাছ থেকে শোনা কথা নয়, তিনি নিজে শ্রীরামকৃষ্ণ সভায় যা' শুনেছেন, যা' দেখেছেন, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তাঁকে যা' বলেছেন, তিনি শুধুমাত্র তাই লিখেছেন। ঠিক স্টেনোগ্রাফারের মতো। আর সেইজন্যই কথামৃতের প্রতিটি বর্ণনা এবং কথা অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত।

এই কাজের জন্যই যেন তিনি নির্দিষ্ট ছিলেন। তিনি আসার আগে একবার স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ লিখতে উদ্যোগী হন। তখন তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'এ কাজের জন্য অন্য লোক আছে।' সেই লোকই হলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

তাঁর জন্ম ১৮৫৪ সালের ১৪ জুলাই এবং দেহান্ত হয় ১৯৩২ সালের ৪ জুন-কথামৃতের পঞ্চম ভাগ প্রকাশের অল্প ক'দিন আগে। তাঁর ৭৮ বছরের জীবনকে আমরা দুটি ভাগে চিহ্নিত দেখি। প্রথমটি হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পরে। তিনি যখন প্রথম এলেন, তখন তাঁর বয়স ২৮ এবং তারপর থেকে অর্ধশতাব্দীর জীবন এক নীরব সাধনায় সমর্পিত। শিক্ষা-দীক্ষায় সে যুগে তিনি অসাধারণ কৃতী বলেই স্বীকৃত। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। অঙ্কের একটি খাতা না দিয়েও তিনি এফ এতে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। বি এ পরীক্ষায়

হয়েছিলেন তৃতীয়। শুধু ছাত্র হিসেবে নন, অধ্যাপক হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। রিপণ, সিটি ও মেট্রোপলিটন কলেজে তিনি ইংরেজি, অর্থনীতি মনোবিজ্ঞান এবং ইতিহাস পড়াতেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা শঙ্করীপ্রসাদ বসুর একটি উদ্ধৃতি স্মরণ করতে পারি: "বিদ্যালয় শিক্ষকতাতেই তাঁর বেশি সময় কেটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি বিদ্যাসাগরের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শেষ ঝামাপুকুর মর্টন ইনষ্টিটিউশন কিনে তার পরিচালক। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের কেউ কেউ তাঁর ছাত্র, পরেও তাঁর ছাত্ররা অনেকে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্যাসী। এর জন্য খ্যাতি বা অখ্যাতি রটেছিল—'ছেলেধরা মাস্টার।' দেহান্তের পরেও সেই খ্যাতি সম্পূর্ণ যায়নি, কারণ, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অনেক সন্ন্যাসী কথামৃত পড়েই প্রথম রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের কথা জেনেছেন। এখনও তাই ঘটছে।"

মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্ত্রী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারের মেয়ে। সেই সুবাদে এই দুজনের মধ্যেও ছিল বিশেষ অন্তরঙ্গতা। কথাটা বোধহয় ঠিক হল না। কারণ, শ্রীম'র কাছে কেশবচন্দ্র ছিলেন 'হিরো।' শ্রীম'র দেহত্যাগের পর স্বামী রাঘবানন্দ "প্রবুদ্ধ ভারতে" (১৯৩২ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যায়) "মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত" নামে একটি ইতিহাস-নির্ভর জীবনকথা লেখেন। ওই রচনা থেকে আমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাই।

তাঁর মৃত্যুর পর "প্রবুদ্ধ ভারত"-এ (১৯:২, জুলাই) প্রকাশিত একটি রচনায় বলা হয়েছে: 'খ্রীষ্টের বাণী তাঁর কণ্ঠ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মতই অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসত, মনে হত, গোটা বাইবেলটাই তাঁর কণ্ঠস্থ।' এই যেমন একদিকে তাঁর বাইবেল অনুরাগ, অন্যদিকে দেখি "চৈতন্য চরিতামৃতের" প্রতি তাঁর পাগল করা প্রেম। স্বামী গম্ভীরানন্দের রচনা থেকে জানি, শ্রীম' স্বয়ং বলেছেন: ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে আমি আগের মত ওই

বই (চৈতন্য চরিতামৃত) পড়তাম। এ তিনটি ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সর্বধর্ম সমন্বয়ের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর যিনি অনুলেখক—তিনিও ছিলেন এ ব্যাপারে সার্থক অনুসারী।

শ্রীম' জ্ঞানী ছিলেন, তাই হতে পেরেছিলেন দীনের থেকে দীন। নিজেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দিয়ে, সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে তিনি কথামৃত রচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি নিত্য অভ্যাসবশে ডায়েরি লিখতেন। বরাবরই ছিল প্রখর স্মৃতিশক্তি—যা' তাঁকে শিক্ষিত সমাজে সেকালে বিশিষ্ট করে রেখেছিল। তাই তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সভার বিবরণ ডায়েরির আকারে পূজার নিষ্ঠায় লিখে রাখতে শুরু করেন, তখন সেটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে হবে। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীম সংসারী মানুষ ছিলেন, তাই প্রতিদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারতেন না। রবিবার বা ছুটির দিনে যেতেন—তাও প্রত্যেক রবিবার নয়।

কথামৃতের পাঁচখণ্ডে মোট পঞ্চাশটি দর্শনের বিবরণ প্রকাশিত হলেও তা ওই চার বছরেরও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নয়। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সন্ন্যাসী সন্তানদের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন সেখানে কোন গৃহী উপস্থিত থাকতেন না। কথামৃতে সেইসব দিনের বিবরণ তাই স্থান পায়নি।

তিনি দক্ষিণেশ্বর দর্শনের যে দিনলিপি অক্ষরে অক্ষরে রেখেছেন, তা এমন গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে রেখেছিলেন কেন? এ ব্যাপারে আমরা তাঁর নিজের কথাই উল্লেখ করতে পারি। তিনি লিখেছেন: 'সংসারে জড়িয়ে আছি, কাজে বাঁধা, ইচ্ছামত ঠাকুরের কাছে যেতে পারি না। তাই তাঁর কথাগুলো টুকে রাখতাম, কোন্ ভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি করতেন, তাও; যাতে করে পরবর্তী সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত ঐসব কথা নিয়ে ভাবতে পারি, যেন সাংসারিক মনকে একেবারে গ্রাস করে না ফেলে। সুতরাং প্রথমতঃ আমি নিজের উপকারের জন্যই নোটগুলি করেছিলাম।'

এই যেমন তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি, তেমনি আরেকটি বক্তব্য পাই। যেখানে তিনি বলছেন: "আমার ছেলেবেলা থেকে ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্তা হত, বার, তিথি, নক্ষত্র, তারিখ দিয়ে লিখে রাখতুম।"

এই ডায়েরির চলিত-বাংলা এক অসাধারণ নজির। চলতি বাংলাকে ইস্পাতের মত তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যা আধুনিকালের পক্ষেও এক পরম বিস্ময়। কথামৃত কীভাবে সমকালের অভ্রান্ত ইতিহাস হয়ে উঠেছে—তা' বুঝতে হলে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেহান্তের পর তাঁর কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—একথা আমরা জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিদ্যাসাগরের বসওয়েল কেউ ছিল না। তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে। প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই।' রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপ অনেকাংশে দূর করেছেন কথামৃতকার, যিনি না থাকলে বা না লিখলে বিদ্যাসাগরের বাড়ি, বসার ঘর, লেখার টেবিল, তাঁর চেহারা ও কথা বলার ভঙ্গি সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য দলিল আমরা পেতাম না।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দুজনের সরস কথাবার্তা এবং বাকপটুতার অসামান্য নজির তুলে ধরেছেন শ্রীম—যা বিদ্যাসাগরের সমকালের আর কোন লেখকের রচনায় নিতান্তই অনুপস্থিত।

শুধুই কি বিদ্যাসাগর? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিশিষ্ট দিকও কি কথামৃতকার উন্মোচিত করেন নি? শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হওয়ার নিপুণ বিবরণ আর কোথায় পেতাম—যদি না শ্রীম তা লিখে রাখতেন? 'যদি', 'বোধহয়', 'মনে হয়' ইত্যাদি শব্দের আড়ালে দাঁড়িয়ে যিনি যতবড় অমূলক গবেষণার সৌধই তৈরি করুন

না কেন, কথামৃতের অভ্রান্ত সত্যতা আজ এক পরীক্ষিত সত্য এবং নিত্যকালের সম্পদ। শুধু কথামৃতসারই নয়, সাহিত্য সম্রাটের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হওয়ার ঘটনাটা যে খুব আনন্দের হয়নি, সেটা বঙ্কিম-বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের লেখা থেকেও জানতে পারি। 'সমালোচক' পত্রিকায় তিনি সেদিনের কথা এভাবেই লিখেছিলেন: 'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বাবু অধরলাল সেনের গৃহে এইদিন বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ ঘটে। পরমহংস কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, শুনিয়াছি আপনার বড় বিদ্যার অভিমান। বঙ্কিমবাবু তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং ধর্মোপদেশ শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতেও পরমহংস নরম হন নাই।' এই রচনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কথামৃত অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হওয়ার ঘটনাটি কথামৃতে বর্ণিত অন্যান্য সকল ঘটনার মতই অভ্রান্ত সত্য।

বাংলা কথামৃতের প্রথম ভাগটি প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে। আর পঞ্চম খণ্ডটি রচনার কাজ শেষ হয় ১৯৩২ সালের তেসরা জুন। পরের দিন ৪ জুন ভোরে তিনি কর্ম সমাপন করে চিরবিদায় গ্রহণ করেন এই প্রার্থনা জানিয়ে: "মাগো, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও।"

কথামৃতের ইংরেজি পুস্তিকার প্রথম খণ্ডটি যখন স্বামী বিবেকানন্দের হাতে এসে পৌঁছল, তখন তিনি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। লিখলেন, (১৮৯৭, ১১ অক্টোবর): তোফা হয়েছে বন্ধু, তোফা! এতদিনে আপনি ঠিক কাজে হাত দিয়েছেন। জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন! সময় বয়ে যাচ্ছে। সাবাস! ওই তো কাজ।' অর্থাৎ স্বামীজী যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের লিখিত ছবি দেখতে চেয়েছিলেন, যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতসমান বাণীর প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন—শ্রীম'র রচনায় তাই পেলেন। তাই তিনি আনন্দে অধীর। এরপর যখন ইংরেজি পুস্তিকার দ্বিতীয় ভাগ তাঁর হাতে এল. তখন তিনি লিখলেন (২৪ নভেম্বর ১৮৯৭): 'ইতিপূর্বে আর

কখনো কোন মহান আচার্যের জীবনকে সাধারণের সামনে লেখকের কল্পনার অনুরঞ্জন ছাড়া এমনভাবে উপস্থিত করা হয়নি যা আপনি করলেন। ভাষা ও প্রশংসার অতীত, এমন সজীব, প্রত্যক্ষ অথচ এমন সহজ স্বচ্ছন্দ। এখন বুঝতে পারছি, আমাদের মধ্যে আর কেউ আগে কেন তাঁর জীবনী লেখার চেষ্টা করেনি। ও কাজটা-ওই বিরাট কাজটা আপনার জন্যই তোলা ছিল। সক্রেটিসের সংলাপের আগাগোড়াই প্লেটোর। আর আপনি আছেন সম্পূর্ণ অন্তরালে। তদুপরি নাটকীয় অংশ অসামান্য সুন্দর (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ) ।”

শুধুই কি স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বের সমকালের প্রখ্যাত মনীষীরাও এইভাবে কথামৃতের ভাব, ভাষা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কথায় মুগ্ধ হয়েছেন। অল্ডাস হাক্সলির মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বলেছেন : “শ্রীম যেভাবে লিখেছেন সেভাবে পূর্বে কখনো কোনো প্রফেটের জীবনী লেখা হয়নি। পরমহংসের জীবনের শেষ দুই বছরের কাজ ও কথার যে অসাধারণ বিবরণ এখানে পাওয়া যায়, তার কাছে বসওয়েলের লেখা জনসন জীবনীও ম্লান হয়ে যায়।’ বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিক ক্রিস্টোফার ইশারউঠের মন্তব্যটিও স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, “শ্রীরামকৃষ্ণ ফেনোমেনন”। কেন ফেনোমেনন ? তিনি ব্যাখ্যা করছেন, ‘ফেনোমেনন সর্বদাই বাস্তব, এটা অভিজ্ঞতালব্ধ যদিও তা নিয়তই অসাধারণ এবং রহস্যাবৃত।’

দেশ থেকে দেশান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী
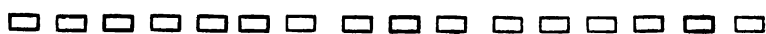
পশ্চিমের চার্চ ও পুবের প্যাগোডার দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা আজ জন-জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ফলে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছে ধীরে ধীরে, এমন একটা ধারণা অনেকেরই। তবে ১৯৮০ সালে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যে সকল প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁদের কথা শুনে ওই ধারণাটাকে লালন করার বদলে বর্জন করার কথাই আমার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, সেইসব দেশের মানুষ আর্থিক সমৃদ্ধির শিখরে বসে মানসিক শূন্যতা ও অবসাদে আচ্ছন্ন। তাই, তাঁরা আবার ফিরে তাকাচ্ছেন আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী, এই বহু-কথিত প্রবচনটি আজ বহুশ্রুত। তাই এই প্রসঙ্গে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। এই ঘটনাটি বর্তমান লেখক জেনেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী রচিত "তব কথামৃতম" শীর্ষক ছয় খণ্ডে বিন্যস্ত জনপ্রিয় বই থেকে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে যখন মস্কোতে ছিলেন, তখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার বক্তৃতা দিতে যান। বক্তৃতার পর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার মত একজন জ্ঞানী এবং আপনাদের মত এক মহান দেশ কি করে ধর্মে বিশ্বাস করেন?'

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সেই ছাত্রটিকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কিসে বিশ্বাস কর?'

আমরা? আমরা বিশ্বাস করি বিজ্ঞানে।

ছেলেটির এই উত্তর শুনে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ আবার প্রশ্ন করেন, 'বিজ্ঞানের কি উদ্দেশ্য বল।'

ছেলেটি বলল, 'বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্যকে আবিষ্কার করা।'

তিনি বললেন, 'আর কিছু না?'

'হ্যাঁ,' ছেলেটি বলল, 'বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের কল্যাণ।' ডঃ রাধাকৃষ্ণণ আবার প্রশ্ন করেন, 'বিজ্ঞানের আর কি কিছু উদ্দেশ্য আছে?' সপ্রতিভ ছেলেটি উত্তর দেয়, 'বিজ্ঞান পৃথিবীকে সুন্দরতর করে তোলে।'

তখন তিনি বললেন, 'এই তিনটি যদি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তুমিও যে আমাদের ধর্মের কথাই বলছ। তুমি বলছ, সত্য, কল্যাণ, আর সুন্দর। আমরা বলি, সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। ঈশ্বরই সত্যস্বরূপ, শিবস্বরূপ এবং সুন্দর-স্বরূপ।'

এই যে নতুন ধর্মচেতনা, যা প্রকৃতপক্ষে ভারতচেতনা—সেটা আজ আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নতুন আবেগের সৃষ্টি করে চলেছে।

আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে যোগ দিতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন থেকে এসেছিলেন শ্রীমতী হেলগা ব্লুমেল। তিনি বোস্টন বিশ্ব-বিদ্যালয়েই কাজ করেন। কলকাতা ও আশেপাশের তীর্থস্থানগুলি দেখেছেন, শুনেছেন মহাসম্মেলনের বাণী। তাঁর ঘরে ঢুকতেই দেখি, টেবিলের উপর মা দুর্গার একটি রঙিন ছবি। শেলফের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা ও বিবেকানন্দের ফোটো। সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজানো একটা ঘর—একট পবিত্র পরিবেশ।

আমি শ্রীমতী ব্লুমেলের কাছে জানতে চাইলাম: 'আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা ভাবনার দিকে ঝুঁকে পড়লেন কেন? কেন আপনাদের নিজস্ব ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারলেন না?' একটু চুপ করে রইলেন তিনি। একবার তাকালেন ঘরের চারদিকে।

তাকালেন মা দুর্গার ছবিটার দিকেও। তারপর সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'দেখুন, আমাদের দেশ বিজ্ঞান ও কারিগরিতে অনেক উন্নত, সমৃদ্ধ বৈষয়িক ব্যাপারেও। কিন্তু ওদেশে অনেকের মধ্যেই ধর্ম সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। ধর্ম সেখানে মানুষের অবলম্বন নয়, ধর্ম জড়িয়ে আছে চার্চের সঙ্গে। কে কোন্ চার্চের সঙ্গে জড়িত, তা দিয়েই তাঁর পরিচয়। সেখানে বিভিন্ন চার্চ, বিভিন্ন মত। কে যে যীশু এবং কে যে ভগবান—তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে দারুণ মতভেদ। কে স্বর্গে যাবেন, আর কে নরকে, তা নিয়েও নানা মত, নানা বিতর্ক। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা দেখা দিতে শুরু করেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে যা পাওয়ার তা পুরোপুরি পেলেই মানুষের জীবনে পূর্ণতা আসে না, মানুষ তার বাইরেও কিছু চায়, চায় প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি।'

শ্রীমতী ব্লুমেল একটু থামলেন। তাকালেন শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে। তাঁর চোখে-মুখে আশার আলো। বললেন, 'জানেন, আমাদের দেশে কেউ যদি স্বর্গে যেতে চান, তাহলেও তাঁকে চার্চের মাধ্যমেই যেতে হবে। চার্চই বলে দেয়, যদি স্বর্গে যেতে চাও, তাহলে তোমাকে এইসব করতে হবে। আগে মানুষে মানুষে যোগাযোগ কম ছিল। এক শহরের সঙ্গে অন্য শহরের দূরত্ব ছিল। ফলে চার্চের আধিপত্য বজায় ছিল। এখন মানুষ অনেক কাছাকাছি আসছে। একটা শহর বাড়তে বাড়তে এসে মিশে যাচ্ছে আরেকটা শহরের সঙ্গে। ফলে, একজনের চিন্তাভাবনা আরেকজন অতি সহজেই জানতে পারছে। এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষের মনের খোরাক যোগাতে পারছে না চার্চগুলি। ফলে, কোন কোন চার্চ অনুগামীর অভাবেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি ফিলাডেলফিয়াতে এরকম নিঃস্ব ও বন্ধ চার্চ দেখেছি। চার্চ সম্পর্কে মানুষ নিস্পৃহ হয়ে যাচ্ছে। ফলে, আত্মরক্ষার জন্য চার্চ এখন বড়লোকের আস্তানায় পরিণত হচ্ছে, যার সঙ্গে সত্য ও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।'

শ্রীমতী ব্লুমেল হাত বাড়িয়ে একটা বই তুলে নিলেন কথা বলতে বলতে। বইটি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ইংরেজি সংস্করণ। একটু যেন ভেবে নিলেন। তারপর সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের দেশে, আজকের এই নতুন সামাজিক কাঠামোয় নতুন মানুষের জীবনে জাগতিক সবকিছু থেকেও এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে। আজকের ছেলেমেয়েরাও সংশয় আর প্রশ্নের সম্মুখীন; পথ কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে বেদান্ত, সংশয়ের অবসান ঘটাতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। কারণ, বেদান্তই শেখায়, একজন আরেকজনের চিন্তাধারাকে সম্মান দেবে, একজন আরেকজনকে মেনে নেবে। ভারতবর্ষ সকল মানুষকে নিজের নিজের অবস্থা ও মত অনুযায়ী মেনে নেয়। বলেনা, তুমি মন্দ, তুমি ভালো। বলেনা, এটাই শেষ কথা, অথবা, আমি যা বলছি, সেটাই শেষ কথা। আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসি। কারণ, আজকের এই হৃদয়হীন যুগে তিনি প্রেমের প্রতীক।' কথা বলতে বলতে শ্রীমতী ব্লুমেল যেন অন্যজগতে চলে গেলেন। তাঁর চোখেমুখে তখন নীরব প্রশান্তি।

এই মহাসম্মেলনে হল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন ইলসে বুশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধ্যাপক ফ্রিডম্যান, মিসেস এবি ফিস, মিঃ ওয়েডেল এবং আরও অনেকে। ইংলণ্ড থেকে এসেছিলেন স্টার্ক দম্পতি, অস্ট্রেলিয়া থেকেও কেউ কেউ। সকলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারিনি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। এত বিদেশী এসেছেন, অথচ মনে হচ্ছিল তাঁরাও যেন তাঁদের স্বদেশেই আছেন। সকলের নামও মনে রাখতে পারিনি। তবে প্রখ্যাত লেখিকা মেরি লুই বার্কের প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব আমার মত অনেককেই বারবার আকৃষ্ট করেছে।

বেলুড় মঠেই দেখা হয়েছিল শ্রীথিওর সঙ্গে। তিনি সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা, কিন্তু জন্মসূত্রে চীনা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তাঁর কাছেই শুনলাম, ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দিতে সিঙ্গাপুর থেকে আটজন

প্রতিনিধি এসেছিলেন। আরও আসতে চেয়েছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে গত বিশ বছর যুক্ত। বললেন, ‘মিশনের কাজ করে আনন্দ পাই, তৃপ্তি পাই। সিঙ্গাপুরে একটি বালকাশ্রম আছে, সেখানে ৫৪টি গরিব ছেলে থাকে। আছে, লাইব্রেরি, মন্দির এবং নিয়মিত ধর্মালোচনার আয়োজন।’ জানলাম, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর শাশ্বত আবেদন ক্রমেই যেন আরও বেশি-সংখ্যক মানুষকে মুগ্ধ করেছে। ঐহিক সমৃদ্ধি এবং কারিগরি উন্নতি সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থার মূলে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, তা পূরণ করার জন্যই ভারত-ধর্ম আজ এত বেশি আদৃত ও প্রার্থিত।

শ্রীলঙ্কাতেও বেদান্তের বাণী এক নতুন আবেগের সৃষ্টি করেছে। ১৯২৪ সালে এই দ্বীপে মিশন কাজ শুরু করেছিল। কলম্বোর রামকৃষ্ণ রোডে গড়ে ওঠে কয়েকটি স্কুল। এখন সেখানে অবৈতনিক গ্রন্থাগার, বিপথগামী শিশুদের জন্য স্কুল, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী হল, অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রম ইত্যাদি অনেকরকম সেবামূলক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিস্তারের কাজ চলেছে। আর সেই সঙ্গে বেদান্তের বাণী এবং হিন্দুধর্মের সর্বজনীন কথা প্রচারিত হয় নিয়মিত—যেখানে প্রতিদিনই অসংখ্য মানুষ আসেন শান্তি পেতে, শান্ত হতে। শুধু এই দ্বীপেই নয়, ফিজি দ্বীপের নাদিতে এবং মরিসাসের ভাকোয়াসে লোককল্যাণের মহাব্রত যেমন উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তেমনি উচ্চারিত ও গৃহীত হচ্ছে কল্যাণ-ধর্মের বাণী।

একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বারোটি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কোথাও নাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কোথাও বেদান্ত সোসাইটি। প্রথম বেদান্ত কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। সেটা ১৮৯৪ সালের ঘটনা। অর্থাৎ, ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে সনাতন ধর্মের বিজয় ঘোষণা, আর ১৮৯৪ সালে নিউইয়র্কের ৭১তম স্ট্রিটে এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা। এখানে নিয়মিত পালিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ উৎসব। পালিত হয় দুর্গাপূজা

ও বড়দিন। সেই সঙ্গে জননী সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন।

শ্রীমতী ব্লুমেল মার্কিণ জীবনে শূণ্যতা পূরণে বেদান্ত বাণীর যে ভূমিকার কথা বললেন, সেই ভূমিকা পালনের এক নতুন পথ ও পদ্ধতির কথা শোনালেন প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী বার্ক।

তিনি বললেন, 'পশ্চিম দুনিয়ার বেদান্ত আন্দোলন যদিও বয়সে নবীন, তবু এরই মধ্যে এর একটা উল্লেখযোগ্য ধরণ এবং পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' বললেন, 'আমেরিকার বেদান্ত সোসাইটিতে আজ একশ্রেণীর আধা সন্ন্যাসী আসছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় জর্জরিত, অথচ সংসারেই আছেন। এরকম আধা সন্ন্যাসী হয়ত অন্যান্য দেশেও আছেন, তবে আমি শুধু মার্কিণ দেশের কথাই বলছি। এই আধা সন্ন্যাসীরাও কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং পার্থিব ভোগ-লালসা থেকে মুক্ত। তাঁরা একটা আধ্যাত্মিক আদর্শকে ধারণ ও অবলম্বন করে লোককল্যাণের ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এভাবে আধা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করাটা খুবই কষ্টকর। কারণ, এই বস্তুতান্ত্রিক পার্থিব অবস্থার মধ্যে থাকব, অথচ এর সঙ্গে জড়াব না, এই পরিস্থিতিতে স্বপথে থাকাটা খুবই কঠিন ব্যাপার।'

তিনি একদিকে যেমন পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্মের স্বতন্ত্র মহিমার কথা শোনালেন, তেমনি শোনালেন এই নতুন পথ ও তপস্যার কথা। তিনি বললেন, 'আজকের এই কারিগরি যুগের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেও এই নতুন ধর্মচেতনা মানুষের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাবে এবং এর সফল ও প্রশান্ত অগ্রগতির জন্যই প্রয়োজন নতুন বিশ্বচেতনা, নতুন মানসিকতা এবং নতুন ধর্ম। আর এ কাজে রামকৃষ্ণ সংঘের আধা সন্ন্যাসীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন এবং করবেন। আর তার ফলেই পৃথিবীর ইতিহাসে যুক্ত হতে চলেছে এক নতুন অধ্যায়, এক নতুন সমাজ।' মেরি লুই বার্কের কণ্ঠে ধ্বনিত হল গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

মার্কিণ সমাজে নবধর্ম প্রবর্তনের এক নতুন পদ্ধতির কথা যেমন শোনালেন শ্রীমতী বার্ক, তেমনি এ ব্যাপারে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, তাও বিশ্লেষণ করলেন অধ্যাপক এরিক জোন্স। শ্রীজোন্স গত পঁচিশ বছর ধরে মার্কিণ দেশে বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেন, মিশনের একটি কেন্দ্রে যখন একজন সন্ন্যাসীর বদলে আরেকজন সন্ন্যাসী আসেন, তখন পরিবর্তিত অবস্থায় কিছু সমস্যা দেখা দেয়। তবে যেহেতু আমরা একই ভাবধারার অনুসারী, তাই সেই সমস্যা মিটে যায় সহজেই।

সমস্যা কী রকম? একজন নতুন সন্ন্যাসী এক নতুন দেশে ও নতুন সমাজ ব্যবস্থায় আছেন। ফলে তাঁকে একটা নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। অবশ্য মার্কিণ দেশের যুবকদের সামনেও এই নতুন মত গ্রহণে একটা বাস্তব সমস্যা দেখা দেয়। তাঁরা শিশুকালে একরকম ধর্ম ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছেন। যৌবনে এসে গ্রহণ করছেন আরেক ধর্ম চেতনা।

এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি, রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম মহাসম্মেলনে, ১৯২৬ সালে স্বামী সারদানন্দজী বলেছিলেন, এই নতুন আন্দোলন বিরোধিতা, উদাসীনতা এবং গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলবে। প্রথমে সেটা দেখা দেবে বিরোধিতা রূপে সেটাই পরে হবে উদাসীনতা। অবশেষে মানুষ এই জীবনধারাকে গ্রহণ করবে। আজকের পাশ্চাত্য সমাজও তাই করছে।

জাপান থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তোসি ইউকি ইয়ামাদা। ইনি রেডিও জাপানের বাংলা শাখায় কাজ করেন। কলকাতায় এসেছেন বাংলা আরোও ভালো করে শিখতে। এরই মধ্যে একবার বাংলাদেশেও ঘুরে এসেছেন। সুন্দর, বিনয়ী এবং সপ্রতিভ যুবক। দক্ষিণ কলকাতায় তার ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল। ঘর ভর্তি বাংলা বই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেমন আছে, তেমনি আছে পৌরানিকা। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, জাপানের ধর্মজীবন

সম্পর্কে। ইয়ামাদা একটু হেসে জবাব দিলেন: বলতে পারেন, জাপানে প্রায় শতকরা ১০০ জনই বৌদ্ধ।

তবে জাপানে একটা নতুন চিন্তাধারা দেখা দিয়েছে, যাকে বলা হয় নয়া বৌদ্ধ। এই নয়া বৌদ্ধরা 'সোকাগাক্কাই' নামেই পরিচিত — যাঁরা এখন মোট জনসংখ্যার প্রায় দশভাগ এবং এঁরা রাজনীতিতে জড়িত। তবে নব্যযুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে শূন্যতা, যারা এখন আর কোন ধর্মে আকৃষ্ট নয়। শুধু পারলৌকিক ক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় বৌদ্ধ পথে। এই নব্যযুবকরা বলেন, 'সোসিকিভুক্ক'—অর্থাৎ, শুধু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই বৌদ্ধধর্ম আছে। বাকি সময় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তাঁরা কোন সম্পর্ক রাখেন না।

ইয়ামাদা হাসতে হাসতে বাংলায় বললেন, "জানেন, জাপানে অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁরা অন্য দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, কিন্তু জাপানে কোন কিছুই করেন না। জাপানের প্রাচীন ধর্ম 'শিন্টো'—যাঁরা মনে করে সর্বত্রই ঈশ্বর আছেন। সেই একই কথা—যা বেদান্তে বলেছে।' জানতে চাইলাম, বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতির যুগে কি মানুষ ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছেন?

তাঁর স্পষ্ট জবাব, 'না, শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের মা-বাবার যুগেও মানুষ মন্দিরে যেতেন না, আমাদের যুগেও যায় না। আমেরিকায় মা-বাবারা চার্চে যেতেন, এখনকার ছেলেমেয়েরা যায় না। তফাৎ এখানেই। তবে জাপানের যুবক-যুবতীরা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পার্ট টাইম চাকরি করে টাকা রোজগার করে। তারপর এখন দলে দলে ভারতে আসতে চান। আসছেনও। অর্থনৈতিক উন্নতি যত হচ্ছে, তাঁরা তত বেশি আধ্যাত্মিক জীবনকে বেছে নিতে চাইছেন।

ইয়ামাদার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি। হঠাৎ দেখলাম, দরজার সামনে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। সেদিকে তাকিয়ে ইয়ামাদা বললেন, 'খুব সুন্দর।'

একদিকে যেমন পশ্চিমী তুনিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রকৃতপক্ষে মুক্তির বাণী, অন্যদিকে কমিউনিস্ট ভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায়ও আজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী অপ্রতিহত গতিতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সম্প্রতি সোভিয়েত দেশ এবং বুলগারিয়া ভ্রমণ করে এসে রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বজন প্রণম্য সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীও সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন। আর দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচারের (গোলপার্ক) স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী "উদ্বোধন" পত্রিকার পুজা সংখ্যায় (১৯৮৪) "সোভিয়েত বিবেকানন্দ-অনুরাগী : একটি সাক্ষাৎকার" শীর্ষক তথ্যবহুল প্রবন্ধ লেখেন। প্রাসঙ্গিক কারণেই সেই রচনা থেকে এখানে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি :

"১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় এসেছিলেন অধ্যাপক ডঃ ই. পি. চেলিশেভ। অধ্যাপক চেলিশেভ সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অগ্রগন্য ভারত তত্ত্ববিদ্। বেশ কিছুকাল আগে তিনি ছিলেন মস্কোর ইনষ্টিটুট অব এশিয়ান স্টাডিস-এর অধিকর্তা। সমসাময়িক ভারতীয়, বিশেষতঃ হিন্দী সাহিত্য বিষয়ে তিনি একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। বহু বছর তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটুট অব্ ইণ্টারন্যাশন্যাল রিলেশনস-এর ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। বর্তমানে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সায়েন্স আকাডেমির অ্যাসোসিয়েট-মেম্বার, সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়নের সদস্য, সোভিয়েত শান্তি কমিটির সভ্য এবং সোভিয়েত ভারত মৈত্রী পরিষদের সহ-সভাপতি। অধ্যাপক চেলিশেভ জহরলাল নেহেরু শান্তি পুরস্কারেও সম্মানিত। মোট কথা অধ্যাপক চেলিশেভ বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্য ও কৃষ্টি জগতের একজন প্রধান পুরুষ।"

"কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটুট অব্ কালচারের আন্তর্জাতিক

অতিথি ভবনে তাঁর সঙ্গে যেদিন দেখা হল সেদিন ছিল নভেম্বরের শেষ দিন।"

"সকাল নটা। ঘরে একাই বসেছিলেন তিনি। হাতে একখানা বই—পড়ছিলেন। সদা হাস্যময় মানুষটি আমাকে দেখেই উচ্ছল হয়ে উঠলেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে হিন্দীতে বললেন: 'আসুন, আসুন। নমস্কার।' এর আগে দেখেছি, অধ্যাপক চেলিশেভ চোস্ত হিন্দীতে অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন। বললাম: 'কি পড়ছিলেন'? হাতের বইটি পাশে রেখে বললেন, "ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ইট্‌স সিক্রেট।' এটা বিবেকানন্দের কমপ্লিট ওয়ার্কস-এর দ্বিতীয় খণ্ড! বিবেকানন্দের লেখা আমার খুব প্রিয়। খুব ভাল লাগে পড়তে। আপনি আমাকে বিবেকানন্দের একটি ছোট মূর্তি যোগাড় করে দিতে পারেন? শুনেছি কলকাতায় নাকি ঐরকম মূর্তি পাওয়া যায়। মস্কোতে আমার ঘরে টেবিলে মূর্তিটি রাখব।"

"আমি বললাম চেষ্টা করব যোগাড় করতে। তারপর বললাম: অধ্যাপক চেলিশেভ, আপনি বলছিলেন বিবেকানন্দের লেখা আপনার খুব ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ডঃ চেলিশেভের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর: নিশ্চয়, নিশ্চয় পারেন। বিবেকানন্দের লেখা শুধু যে আমারই ভাল লাগে তাই নয়, সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দ বেশ কিছুকাল থেকেই একটি জনপ্রিয় নাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমার মতো বহু মানুষ আছেন, যাঁরা বিবেকানন্দকে ভালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখা ভালবাসেন। কত সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ তাঁর লেখা। আর মানুষের প্রতি কী গভীর দরদ। প্রায় নব্বই বছরের পুরানো হলেও তাঁর লেখা আজও সমান তেজোদীপ্ত, সমান ভাবে প্রেরণাপ্রদ! বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরো বেশী করে জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আমার দেশবাসীর মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে। আমরা মনে করি, বিবেকানন্দের চিন্তা, তাঁর আদর্শ, তাঁর রচনা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের সম্পদ।"

"প্রশ্ন করলাম: কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী, ধর্মের জগতের মানুষ। মার্কসবাদী হয়েও তাঁর প্রতি আপনার এবং আপনার দেশের মানুষদের এই আকর্ষণ, আপনার এখানকার মার্কসবাদী বন্ধুদের অনেককে অবাক করবে না?"

"ডঃ চেলিশেভ আমার মুখ থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন: 'আমাকে এদেশের এমন একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন বিবেকানন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার যে সব মার্কসবাদী বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করে না, তাঁরা হয় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা পড়েননি, অথবা অজ্ঞতাবশত: বিবেকানন্দকে তাঁরা নিছক একজন ধর্মীয় সংগঠক হিসাবে ধরে নিয়ে বসে আছেন। বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি খুব ভালভাবে পড়েছি এবং তার উপর পড়েছি তাঁর কয়েকখানা প্রামাণিক জীবনী। তার ভিত্তিতে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, বিবেকানন্দকে যদি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত ধর্মীয় প্রচারক হিসাবেই দেখা হয়, তাহলে তা হবে একটা বিরাট ভ্রান্তি। সাধারণ অর্থে একজন ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা বলতে যা বোঝায়, বিবেকানন্দ কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মহান 'প্রফেট'। তিনি ছিলেন মৌলিক ভাবনা সম্পন্ন একজন চিন্তানায়ক, স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন একজন উদার মানবপ্রেমী।"

"তিনি বললেন: 'আসলে ধর্মের দুটো দিক আছে—একটা ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক দিকটিই বেছে নিয়েছিলেন। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব বিভেদ বাড়িয়ে তোলে। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, বিবেকানন্দের চিন্তা ও পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান পায়নি।

রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। তাই বিবেকানন্দকে এবং তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা প্রচলিত অর্থে নিছক ধর্ম নেতা মাত্র বলে ভাবি না। বিশ্লেষণধর্মী কোন গবেষকের কাছেই তাঁদের সেভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। তাঁরা যে সব ধর্ম-উপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন পরিণত সমাজ সংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথার্থ মানবতাবাদী চিন্তাবিদের মতের কোন অমিল নেই।"

"রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন: "খালি পেটে ধর্ম হয় না, যার হেথায় নেই, তার হোতায়ও নেই" আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: "আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না, যে ধর্ম বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না, পারে না ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে" বলছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো," বলছেন, "জীবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধর্ম।" কোন দেশের কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরুর মুখে কোন কালে এরকম কথা কেউ শুনেছে?"

"আমার মনে হয়, মার্কসীয় ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের বড় কাছাকাছি। বিবেকানন্দের "কালী দি মাদার" কবিতায় কালীর যে কালনৃত্য কল্পনা যেখানে কালীর তাণ্ডব নৃত্যের প্রত্যেক পদাঘাতে সৃষ্টি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার তাৎপর্য হচ্ছে, পুরানো সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাবকে আহ্বান জানাচ্ছেন বিবেকানন্দ। কালীর নৃত্য ঐ প্রক্রিয়ার প্রতীক। বিবেকানন্দের "অ্যারাইজ অ্যাণ্ড অ্যাওয়েক' বাণী শ্রমজীবী মানুষদের জাগরণের মন্ত্র। এই প্রসঙ্গে বলি, রাশিয়ার জনৈক সাম্প্রতিক কবি বিবেকানন্দের এই বাণীকে অবলম্বন করে একটি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। বিবেকানন্দ রাশিয়ায় না গিয়েও বুঝেছিলেন সেখানে বিপ্লবের পটভূমি

তৈরি এবং সেখানকার নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ স্বৈরাচারী জার শাসনের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

এবার উত্থাপিত হল সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। উত্থাপন করলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। উত্তরে ডঃ চেলিশেভ বললেন:

"দেখুন, বিবেকানন্দ-চর্চা এবং গবেষণার কাজে তাঁর গুরুর প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কারণ রামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নকেই তো বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই রামকৃষ্ণদেবও আমার এবং আমার দেশবাসীর কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বাণী বস্তুতঃ অভিন্ন। বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় মানব সভ্যতা যখন চরম সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পথ আজ সবচেয়ে কার্যকরী সমাধানের সূত্রটি উপস্থাপন করেছে।"

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বোম্বার স্কোয়াড্রনের একজন নেভিগেটিং অফিসার। যুদ্ধের বিভীষিকা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শুরু হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে তা সহস্রগুণ মারাত্মক হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু সোভিয়েত দেশেই অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। এরই অভিজ্ঞতা থেকে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আজ বিশ্বব্যাপী চলছে শান্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সমর্থনে আন্দোলন, মিছিল। শান্তি, মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণীই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী। সেই বাণীই আজকের বিপন্ন পৃথিবীকে বাঁচার পথ দেখাতে পারে।"

'আমি মনে করি, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজ যেভাবে বিশ্বকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। সমকালীন ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে তাঁদের বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকের

পৃথিবীতে তার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশী। ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে ঐ ভাবাদর্শকে বোঝার জন্য আজ সোভিয়েত রাশিয়ায় বহু গবেষক ও চিন্তাশীল মানুষ রামকৃষ্ণ, বিশেষ করে বিবেকানন্দ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আমার ভাবতে গর্ব হয় যে, আমার দেশে এই চর্চায় আমি অন্যতম পুরোধার ভূমিকা পালন করতে পেরেছি। আমি মনে করি, আমাদের এই কাজ সমগ্র মানব জাতির সেবা স্বরূপ।"

ডঃ ই. পি চেলিশেভের সঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের সামান্য অংশই এখানে তুলে ধরলাম এবং তা থেকেই সোভিয়েত দেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রীতির কিছু আভাষ পাওয়া যাবে।

আরেকটি কমিউনিস্ট দেশ পোল্যাণ্ড। সেখানকার একটি ছাত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান লেখকের পরিচয় হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গটি এখানে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

আমরা যারা এ-দেশের উন্নাসিক সম্প্রদায়, যারা ইওরোপ-আমেরিকার অফুরন্ত ভোগবিলাসের স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না, তারা হয়ত জানি না, প্রতি বছর কত বিদেশী জ্ঞানীগুণী এই ভারতবর্ষকে নতুন করে আবিষ্কার করতে এদেশে আসেন। ধর্ম পুরাতত্ত্ব ভাস্কর্য চিত্রকলা ইত্যাদি নানা বিষয়ের মধ্যে এদেশের মহিমা সন্ধান করতে করতে তাঁরা চলে আসেন এই কলকাতা শহরেও।

পোলাণ্ডের উত্তরাংশে বিস্তৃত গুদেনিয়ার মেয়ে মারিয়া এ-শহরে এসেছিলেন গীতার উপর উপনিষদের প্রভাব এবং গীতার অবদান নিয়ে গবেষণা করতে।

পোলাণ্ডের গুদাইস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন মারিয়া। সেই পরীক্ষার সময় তাঁকে যে থিসিস জমা দিতে হয়েছিল, সেই থিসিসের বিষয় ছিল পোলিশ সাহিত্যে গীতার প্রভাব এবং

অনুবাদ। কিন্তু গীতার উপর তাঁর এই আকর্ষণের উৎস কি? মারিয়া জানিয়েছেন, ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রথম থেকেই। তার থেকেই জন্ম নিয়েছিল গীতার প্রতি অনুরাগ।

পোল্যাণ্ডে গীতা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির পিছনেও একটা ইতিহাস আছে। রোমান্টিক যুগে পোলিশ সাহিত্যিকরা রাজনৈতিক কারণে ফরাসি দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখনই তাঁদের সঙ্গে গীতার পরিচয়। মূল সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে গীতা অনূদিত হয়। পরে ইংরেজি থেকে ফরাসিতে। ফরাসি থেকে পোলিশ ভাষায়। এটা অবশ্য প্রথম যুগের ঘটনা। পরবর্তী সময়ে মূল সংস্কৃত থেকেই পোলিশ ভাষায় গীতা অনূদিত হয়েছে। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে পোলাণ্ডের সব থেকে প্রভাবশালী কবি ইউলিউস সোভাৎস্কির অবদান এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়। আর পোলিশ সাহিত্যে গীতার প্রভাব নিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ করেন অধ্যাপক হুয়ান টুটিংনস্কি—যাঁর কাছে মারিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

পোলিশ ভাষায় শুধু গীতা-উপনিষদ নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে। অনূদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তবে মারিয়ার মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-গ্রন্থটি তেমন ভালো হয়নি। তাই তিনি নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি বই লিখতে চান।

মারিয়া সময় পেলেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেছেন, গিয়ে বসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে।

মারিয়া জানিয়েছেন, পোলাণ্ডে ভারত-চর্চা দিনে দিনে বাড়ছে। আগামী দিনে আরও বাড়বে।

শুধু একজন মারিয়া নয়। এরকম অনেক মারিয়া আজ বস্তু-তান্ত্রিকতার যন্ত্রজীবনে ক্লান্ত-অবসন্ন। তাই তাঁরা অপার অনন্ত প্রেমের উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে আত্মসমাহিত হয়ে ধন্য হতে চান।

পরিশিষ্ট

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনভূমি এই "মাতৃভূমি"

বঙ্গভূমিকে আমরা অতি সহজেই "মাতৃভূমি" বলে বিশিষ্ট করতে পারি। এখানে স্বদেশমন্ত্রের বীজ রোপন করা হয়েছিল মাতৃমন্ত্রের উদ্বোধনে, স্বদেশসাধনার সূত্রপাত কালীমূর্তির সমন্বয়ে, বলা হয়েছিল : "বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি", আবার বলা হয়েছিল : "বা হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, ডান হাত করে শঙ্কাহরণ।"

প্রকৃতপক্ষে এবং ব্যাপকার্থে দেশজননীর মহারূপ যেন বারবার মহাকালীর জননী রূপে মিশে গেছে। মাতৃরূপা যেন আমাদের জীবনরূপায় পরিণত হয়েছেন।

শুধু আমাদের স্বদেশমন্ত্রের বাণীরূপা নন তিনি, তাঁকে আশ্রয় করেই এই বঙ্গের শক্তিসাধনা, সংস্কৃতি এবং সঙ্গীত ভাবনা এক দীপ্ত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। গঙ্গার পলিমাটিতে গড়া এই নরম মাটির দেশে 'শক্তি' শব্দটির কাঠিন্য ও ভীষণতা ভক্তি ও ভাবসম্পদের কোমলতায় এক অপরূপ রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমন যে ভীষণা মাতৃমূর্তি, তাঁকেও আমরা কত সহজে স্নেহময়ী মাতৃভাবনায় আপন করে নিয়েছি। কখনও ইনি আমাদের চোখে জগজ্জননী, কখনও আমাদের দৃপ্ত-প্রেরণায় ইনিই হচ্ছেন দেশজননী। এই মাতৃভাব কোন ধর্মীয় সংস্কারের সংকীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়।

আমরা দেখতে পাই সাধক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত শ্রদ্ধাভক্তির আশ্রয়ে থেকে এবং সংগীতে অঞ্জলি দিয়ে জীবন সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেন। আদ্যাশক্তিরূপিনী শ্রীশ্রীকালীই মূলাধারে কুণ্ডলিনী, তিনি যোগ্যলভ্যা—এসবই সত্য, তবে সব থেকে বড় সত্য হল এই যে, তিনি মা, তিনি সন্তানের কাছে ধরা দেন। কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের জীবনে তারই প্রমূর্ত প্রকাশ দেখি। দেখি, শক্তিসাধনা

সুকঠিন যোগসাধনার স্তর থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তির প্রাবল্যে অতি সহজেই সুমধুর ভাবসাধনার লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের "মাতৃসংগীত" বাংলার ভাবজগৎ ও কাব্যজগতের অমূল্য সম্পদ।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বঙ্গভূমির সুপ্রাচীন মাতৃসাধনার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। সরল শিশুর মত ভক্তি আর সর্বস্বসমর্পিত বিশ্বাস—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি এমন এক ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন, যা আজকের সংশয়াচ্ছন্ন বিশ্বকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। সাকারও নিরাকার তত্ত্বের বিভ্রম কাটিয়ে তিনি এক নবজীবনবেদের পথপ্রদর্শক। তিনি ধর্ম্মকে লোক-কল্যাণ এবং আত্মশক্তির পুনর্জীবনে প্রয়োগে করেন, স্বজীবনের মাহাত্ম্যে প্রমাণ করেন, "মত কিছু পথ নয়", "যতমত তত পথ।"

অবিশ্বাসী হৃদয় নিয়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত গিয়ে হাজির হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, প্রশ্ন করলেন: আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? পেলেন স্পষ্ট উত্তর, যা পাওয়ার জন্য সংশয়াচ্ছন্ন নরেন্দ্রনাথ অনেকের কাছে ছুটে গেছেন, ছুটে গেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছেও। শুনলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে: হ্যাঁ, ঈশ্বরকে দেখেছি। যেমন তোকে দেখছি, তেমনই। যেমন তোর সাথে কথা বলি, তেমনি ভাবেই মায়ের সাথে কথা বলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আমরা বারবার এই প্রসঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। কারণ, সে যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ প্রশ্ন তুলেছিলেন: ব্রহ্ম বুঝি, কিন্তু এই কালীমূর্তি কেন? ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মত বিজ্ঞানীও বলেছেন: কালী? সে তো একটা সাঁওতাল রমনী। দেশীয় ব্যক্তিদের একাংশ যখন এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তখন বিদেশ থেকে আগতা ভগিনী নিবেদিতা মুক্তকণ্ঠে সে-প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহজ-সরল ভাষায় ধর্মের মূলতত্ত্বকে বিবৃত করেন, অঙ্গুলি তুলে দেখিয়ে দেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ, বলেন: ব্রহ্ম আর কালী আলাদা নয়। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলি, যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল যখন হেলচে-দুলচে, তখন সেটা শক্তির উপমা। ব্রহ্ম হচ্ছেন সাক্ষস্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, দ্রষ্টা, তিনি নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ; আবার তিনিই যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, ধ্বংস করছেন, তখন তিনি হচ্ছেন কালী, বা শক্তি। আমরা কালীমূর্তিতে দেখি, মা কালীর পদতলে শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। ব্রহ্মের প্রতীক হচ্ছেন শিব। নিষ্ক্রিয় তিনি, দ্রষ্টা তিনি। আবার তিনিই যখন কালী হয়েছেন, তখন তিনি নিত্যচঞ্চলা। মা কালীর এক হাতে বরাভয়, আর এক হাতে খড়্গ। এক হাতে অভয় দান করছেন, অন্য হাতে তিনি ধ্বংস করছেন—একই শক্তির বিপরীতমুখী ক্রিয়া। বেদান্তে যাকে বলছে ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যে সেটাকে পুরুষ ও প্রকৃতি, আর তন্ত্রে সেটাকেই বলছে শিব ও শক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্র পড়েননি, অথচ এমন সব কথা সহজ-সরল ভাষায় বলেছেন, যা শাস্ত্রেরই বচন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লিখিত বচনই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় মূর্ত হয়, যখন তিনি বলেন: যেমন মণির জ্যোতি আর মণি, অভেদ। মণির জ্যোতি ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়।

প্রকৃত পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর জড়তা, সংশয় এবং পাশ্চাত্যের প্রতি মোহ থেকে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষকে নতুন ভাবসম্পদের গৌরবে যুক্ত করেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং দক্ষিণেশ্বরের বাণী যেন বেলুড়ের সাধনপীঠে এক বিদ্যুত তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যা বিশ্বজগতের মুক্তিস্বরূপ। মাতৃসাধনার ইতিহাসে তারাপীঠের মাতৃপ্রাণ মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার নাম অবশ্যই স্মরণীয়।

কিন্তু কে এই কালী—যাকে নিয়ে এমন এক মহাসাধনার ধারা এই বঙ্গভূমে রচিত হয়েছে? কালীতত্ত্ব প্রসঙ্গে কালতত্ত্ব আলোচ্য। মহাভারতে বর্ণিত বকরূপী ধর্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেন: বার্তা কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন: মোহরূপ পাত্রে মহাকাল সকল প্রাণীকে গ্রাস করার জন্য পাক (রান্না) করছেন। এই রন্ধন যজ্ঞে মাস আর ঋতু হল হাতা, সূর্য হল আগুন, রাত্রি আর দিন হল জ্বালানি। যুধিষ্ঠিরের মতে, এই হল বার্তা—যা মনে রাখতে হবে। জীব যেন মরণের জন্যই জন্মগ্রহণ করে—দিন, সপ্তাহ, মাস, বর্ষ অতিক্রান্ত হয়, আর জীব এগিয়ে চলে সেই অন্তিম এবং অনিবার্য পরিণামের দিকেই।

এই যে কাল, এই যে মহাকাল—যা' সর্বজীবের গ্রাসকারী, সেই কাল বা মহাকালকেও যিনি গ্রাস করেন, তিনি হচ্ছেন কালী, তিনিই হচ্ছেন আদ্যাশক্তি। এই হচ্ছে মহানির্বানতন্ত্রের ভাষ্য। কালের পশ্চাতে যে কালজয়িনী মহাশক্তি বিদ্যমান, তাঁকে উপলব্ধি করে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার সাত্ত্বিক সংকল্পেই আমাদের সংসারে অনুষ্ঠিত হয় কালীপূজা। কাল নির্মম সত্য, কিন্তু চূড়ান্ত সত্য নয়—কালেরও নিয়ন্তা আছে--"কালনিয়ন্ত্রাৎ কালী তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী" কালী হচ্ছেন আদ্যাশক্তিস্বরূপিনী। কালের উৎপত্তি যখন হয়নি, তখনও ছিলেন মহাকালী—যিনি নিখিল বিশ্বের আদি বীজ। মহানির্বাণতন্ত্র বলছেন: হে দেবী, সৃষ্টির আদিতে তমোরূপে তুমিই মাত্র ছিলে, তোমার সে তমোময় রূপ বাক্য ও মনের অগোচর। কালিতত্ত্বের এই হচ্ছে মূলগত মর্ম।

মৃত্যু এবং অমৃত, ভয় এবং অভয়, সংগ্রাম এবং বিজয়, বীর্য এবং মাধুর্য সৃষ্টি এবং সংহার-দুটি বিরুদ্ধ গুণই কালীমূর্তিতে সুসঙ্গতরূপে সমন্বিত। তিনি "ঘোরা", আবার তিনিই "দিব্যা।" সৃষ্টি ও সংহার, মৃত্যু ও অমৃতের দু'টি বিপরীতমুখী, অথচ শাশ্বত ধারা একাত্মা হয়ে একদেহে, এক মূর্তিতে আর কোন দেশের কোন দার্শনিক চিন্তায় কি এমন

প্রাণবন্ত ও সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে ? সমন্বয়ের লীলাভূমি ভারতবর্ষেই এটা সম্ভব এবং সেই মহাসাধনার প্রতীক হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সর্বব্যাপিনী বিশ্বমাতাকে আবৃত করতে পারে তেমন বসন কোথায় ? তাই তিনি দিগম্বরী। আর শ্রীশ্রীকালীই তো আপন চৈতন্যসত্ত্বায় সকল দিক পরিব্যাপ্তকারিণী। দিক্‌রূপ বসন তাঁকে আবৃত করতে পারেন, তাই তিনি দিগ্‌বসনা। তিনি মুক্তস্বভাবা, প্রসাধনবিমুখা ও চিরবৈরাগ্যময়ী—তাই তিনি মুক্তকেশী। শ্রীশ্রীকালীর গলে মুণ্ডমালা, কটিদেশে নরকরকাঞ্চী কেন ? জ্ঞানাংশে মুণ্ডমালা, আর কর্মাংশে নরকরকাঞ্চী।

কালীর ত্রিনয়ন—দেবী জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিরীক্ষণ করেন। একটি নয়নচন্দ্র, একটি সূর্য এবং একটি অগ্নি। সাধনার বিচিত্র ধারায় এবং সাধকের ঐকান্তিকতায় দেবী কখনও দক্ষিণাকালী, কখনো শ্মশানকালী, আবার কখনও ফলহারিণী-কালী। মাতৃসাধনার লীলাভূমি এই সঙ্গে আমরা মহাকালীর বিভিন্নরূপের সন্ধান পাই। ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, ছিন্নমস্তা, রটন্তীকালী, সিদ্ধকালী, রক্ষাকালী হংসকালী, গুহ্যকালী প্রমুখ বিভিন্ন কালীরূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

আমরা স্বদেশা-দেবতা ও মাতৃদেবীকে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি তাই স্বদেশপ্রীতি এবং মাতৃসাধনা একসূত্রে গ্রথিত। কারণ, স্বদেশ আমাদের কাছে জননীস্বরূপা। স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে দেশজননীর পূজায় আত্মদানেব আহ্বানে জানিয়েছিলেন এবং সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের ঘরের দামাল ছেলেরা একদিন হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি বরণ করে নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন, বললেনঃ কর্মই ধর্ম। বললেনঃ দরিদ্রের মধ্যেই ঈশ্বর বর্তমান। দরিদ্রই আমাদের দেবতা হোক, মূর্খই আমাদের দেবতা হোক, দেশই আমাদের মাতৃস্বরূপা হোক। স্বামী বিবেকানন্দের সেবামন্ত্র আমাদের আজকের পূজামন্ত্র এবং সেই পূজামন্ত্রেই আমরা সকল অশুভশক্তি, সকল অন্ধকার, সকল বিপদের বিরুদ্ধে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করতে সমর্থ হব। শক্তিসাধনা আজ আমাদের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করুক, বিদ্বেষ ও হিংসার জ্বালাবৃত্তি থেকে আমাদের চিত্তকে মুক্ত করুক—মহাকালীর কাছে এই হোক সর্বজনের প্রার্থনা।